ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি

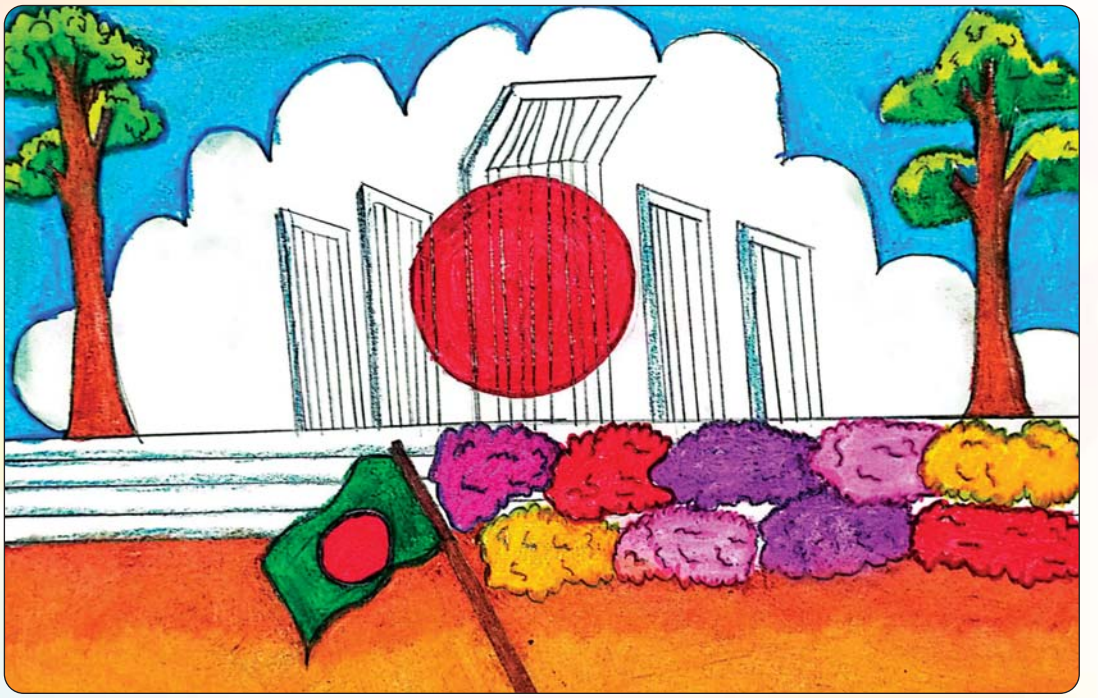

তারান্নুম সাদিকা, পঞ্চম শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সাবরীনা ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, সিদ্বেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদকীয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। পরাধীনতার শিকল থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে ভাষা আন্দোলনের অবদান ছিল অপরিসীম। ১৯৫২ সালের এ দিনে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোরে খালি পায়ে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আর চারদিকে ধ্বনিত হয় প্রভাতফেরির গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলা ভাষা বিশ্বে আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে গৌরবময় আসনে আসীন। এ দিনটি এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। মহান ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতার চেতনা।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশে কোনো ছাত্র আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে সফল হয়েছে ছাত্ররা। যখন আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার ছিল না, তখনও পাকিস্তানি শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জয়ী হয়েছে ছাত্ররা। স্বাধীন বাংলাদেশে নানা সময়েও একইভাবে সফল হয়েছে সকল ছাত্র আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা রক্ত দিয়েছে, তবু দমে যায়নি; বিজয়ী বেশে ফিরেছে ঘরে। ছাত্র-আন্দোলনের বিজয়ের এ ধারাবাহিকতায় এবার যোগ হয়েছে আরেক অধ্যায় : ২০২৪-এর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বন্ধুরা, একুশে ফেব্রুয়ারি ইতিহাস চর্চা করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। এ ইতিহাসকে স্মরণ রেখে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের আদর্শ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

ভালো থেকো তোমরা সবাই আর সাথে থেকো নবারুণের ।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

৪ ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি/ জায়েদুল আলম

১৪ ১৯৫২ থেকে ২০২৪ : আমি ও আমার অনুজেরা আবু জাফর আবদুল্লাহ

৩৩ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস/ মেজবাউল হক

৫১ অমর একুশে গ্রন্থমেলা/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

৫৩ তারুণ্যের উৎসব ২০২৫/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৬ বসন্তে কোকিল কেন ডাকে/ আরিফুল হক

৫৮ প্রথম বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট/ শাহানা আফরোজ

৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

১০ একুশের মা/এনায়েত রসুল

১৮ ভাষা আন্দোলন/ সাঈদুর রহমান লিটন

২০ শহিদমিনারের কিশোরেরা/ বিচিত্র কুমার

২২ শহিদমিনারে/ কবির কাঞ্চন

২৬ একুশের ভিনজগত/ কামাল হোসাইন

৩৭ কেন লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়া/ সারমিন ইসলাম রত্না

৪০ একটি ভাষার গল্প/ পঙ্কজ শীল

৪২ বর্ণমালার গল্প/ মিতুল সাইফ

৪৪ মায়ের মতো মিষ্টি/ সারাফ নাওয়ার

ছোটোদের ছড়া

৩১ সায়মা জাহান তন্বী

৪৭ তাসিন হোসেন/ জাওয়াদ আলম

কবিতাগুচ্ছ

০৯ শান্তা মারিয়া/ হানিফ রাজা

১৭ আহসানুল হক/ তাহমিদ হাসান

৩১ মিয়াজান কবীর

৩২ বেণীমাধব সরকার/ হুসাইন আলমগীর

৩৪ কাজল নিশি/ সনজিদ দে

৩৫ রাশেদ আহাম্মেদ সাদী/ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার

৩৬ মো. তাইফুর রহমান/ শফিকুল মুহাম্মদ ইসলাম

৪৫ নকুল শর্ম্মা/ নূর মোহাম্মদ দীন

৪৬ আনোয়ারুল হক নূরী/ মো. কামরুজ্জামান

৪৭ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু

৪৮ আসাদুজ্জামান খান মুকুল/ মাহফুজুল ইসলাম

৫৫ মো. জাহিদুর রহমান

ছোটোদের গল্প

৪৯ বইমেলার ভালোবাসা/ ফারদিন শামস তিমির

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : তারান্নুম সাদিকা/ সাবরীনা ইসলাম

তৃতীয় প্রচ্ছদ : মো. তাহসিন ইসলাম রুহি/ আরিশা হাসান

শেষ প্রচ্ছদ : নাফিসা তাবাসসুম

৩৬ মো. নাইমুল ইসলাম

৫৯ নাফি-উল আলম

৬০ সামিহা হোসেন উম্মি/ আনায়াহ্ আশরাফ

৬৩ সাফওয়ান হক/ সাইয়ান খান

৬৪ আফিফা আলম/ ফাতেমা জান্নাত

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

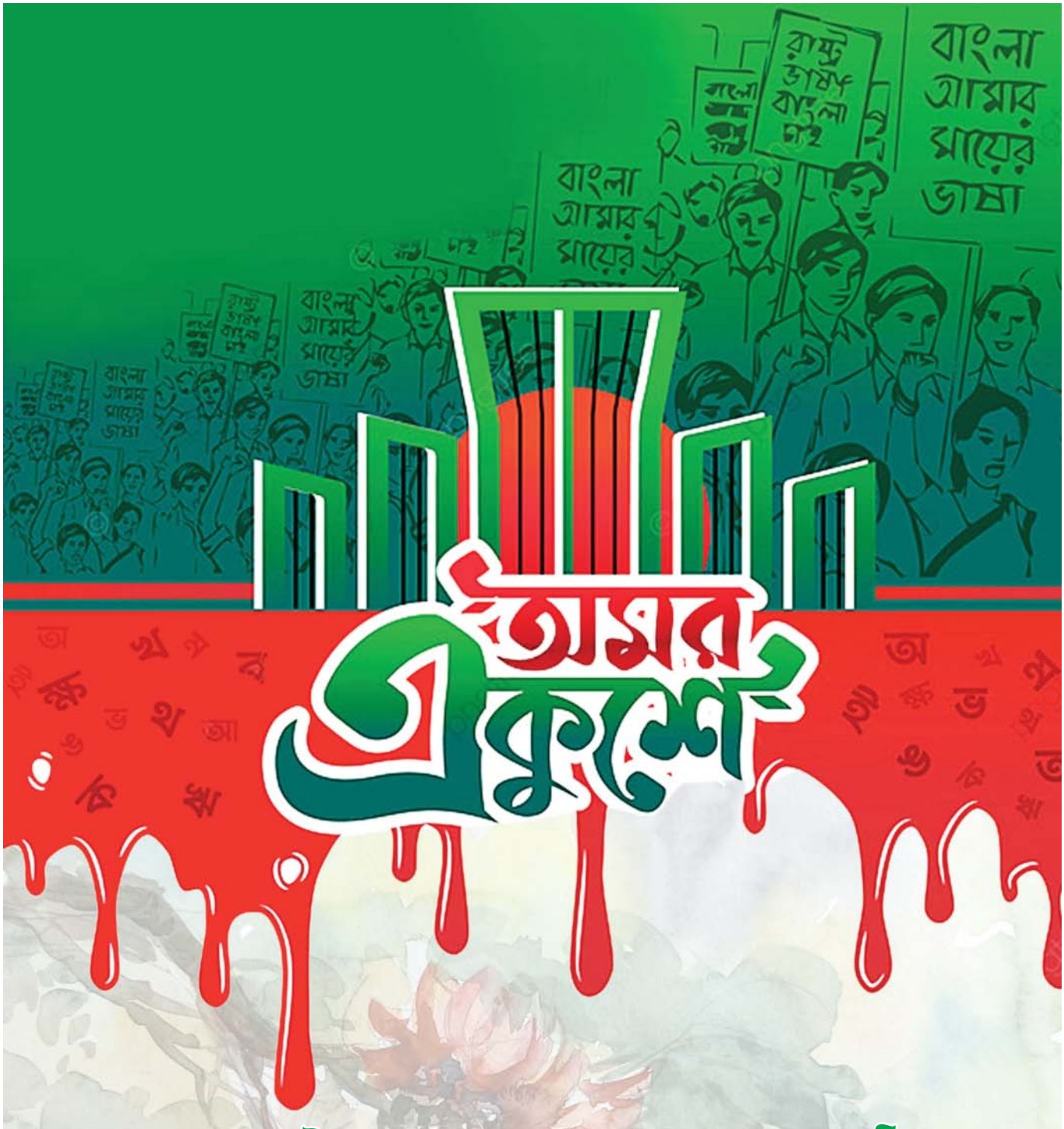

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ...

ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি,
২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি

জায়েদুল আলম

ভাষা আন্দোলন - বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের সংগঠিত একটি গণ-আন্দোলন। যাকে আমরা বাংলা ভাষার আন্দোলন বা একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন বলে অভিহিত করে থাকি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি

ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং ভাষার ব্যাপারে তাঁরা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করেন। দাবিটি হলো: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি- বাংলা ও উর্দু।

ভাষা সংক্রান্ত এই দাবিকে সামনে রেখে সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং একসময় তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভার পরও মিছিল-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এ মাসেরই শেষদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। পরের বছর ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখই পূর্ব পাকিস্তানের, যাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বিরোধিতা করলে এ দাবি বাতিল হয়ে যায়। এ খবর ঢাকায় পৌঁছালে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বিক্ষুব্ধ হন। আজাদ-এর মতো পত্রিকাও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনা প্রস্তাবে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সমালোচনা করে। পরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন শামসুল আলম।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। গণপরিষদের ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ ওইদিন ঢাকা-শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই স্লোগানসহ মিছিল করার সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। আব্দুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল প্রমুখ ছাত্রনেতাও উক্ত মিছিলে অংশ নেন; বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়। একজন পুলিশের নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের আঘাতে মোহাম্মদ তোয়াহা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ১২-১৫ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।

আন্দোলনের মুখে সরকারের মনোভাব কিছুটা নমনীয় হয়। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে চুক্তিতে তিনি অনেকগুলো শর্তের সঙ্গে একমত হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাকে কোনো কিছুই মানানো যায়নি।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুই জায়গাতেই তিনি বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়; এর আহবায়ক ছিলেন আবদুল মতিন।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা ও শোষণের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এখানকার জনগণ ক্রমেই এই মতে বিশ্বাসী হতে শুরু করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় তাদের ওপরে আরোপিত হয়েছে নতুন ধরনের আরেক উপনিবেশবাদ। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

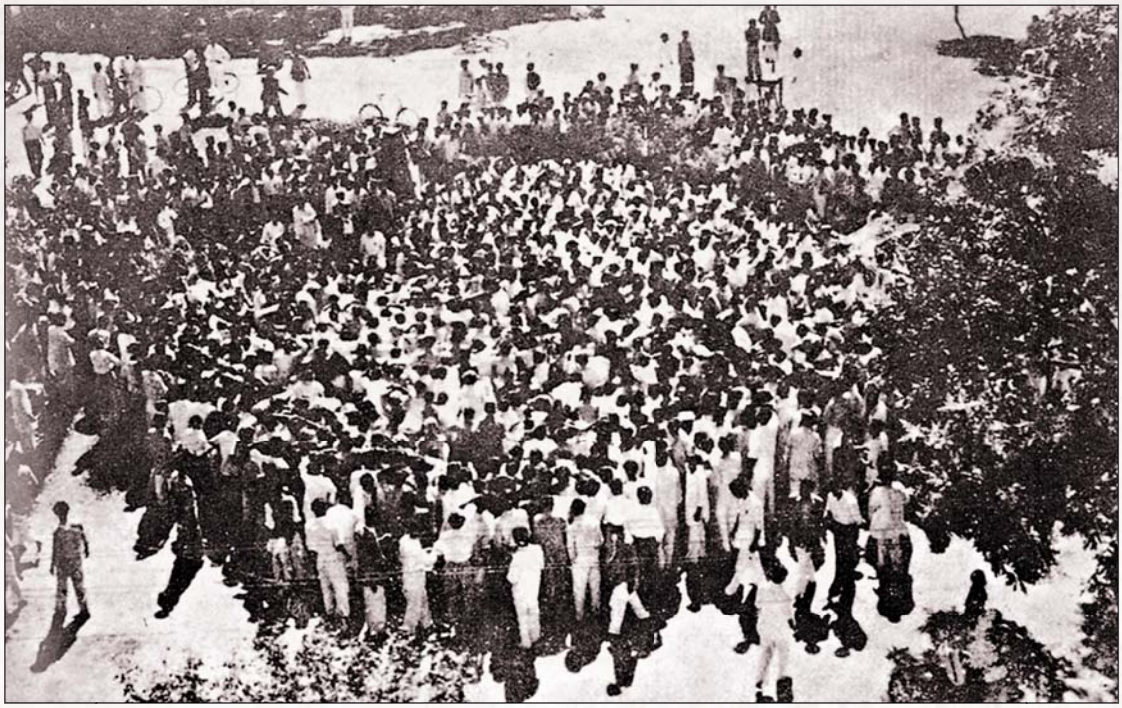

১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের (১৯০৫-৭৪) সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কিনা এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয় তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সঙ্কল্পে অটুট থাকে।

পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আবদুল মতিন এবং গাজীউল হক নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকতসহ আরো অনেকে শহিদ হন। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়। অহিউল্লাহ্ নামে আট/নয় বছরের এক কিশোরও সেদিন নিহত হয়।

এ সময় গণপরিষদের অধিবেশন বসার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলি চালানোর খবর পেয়ে গণপরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং বিরোধী দলের সদস্যসহ আরো কয়েকজন সভাকক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষার দাবির বিরোধিতা অব্যাহত রেখে বক্তব্য দেন। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ ও পুলিশি নির্যাতনের দিন। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ে ও শোকমিছিল বের করে। মিছিলের উপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। ছাত্ররা যে স্থানে গুলির আঘাতে নিহত হয় সেখানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী নির্মাণের জায়গায় একটি কংক্রিটের স্থাপনা নির্মিত হয়। গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অবশেষে, ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়। আর ১৯৮৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষা প্রচলন বিল পাস হয় এবং মার্চ ১৯৮৭ সাল থেকে কার্যকর হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময় সেক্রেটারি জেনারেলের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠিটি আসে। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০শে জানুয়ারি রফিককে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব

আনার ব্যবস্থা করেন। পরে রফিক, আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। এতে একজন ইংরেজি ভাষী, একজন জার্মান ভাষী, একজন ক্যান্টোনি ভাষী, একজন কাচ্চি ভাষী সদস্য ছিলেন। তারা আবারো কফি আনানকে 'এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন, এবং চিঠির একটি কপি ইউএনওর কানাডীয় দূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে তারা জোশেফের সাথে ও পরে ইউনেস্কোর আনামারিয়ার সাথে দেখা করেন, আনামারিয়া পরামর্শ দেন তাদের প্রস্তাব ৫টি সদস্য দেশ- কানাডা , ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দ্বারা আনীত হতে হবে। তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দানে ২৯টি দেশ অনুরোধ জানাতে কাজ করেন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ১৯৫২ সাল থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল। এখন এ দিনটি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে এসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময়- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি... গানের করুণ সুর বাজতে থাকে। আমরা বিনম্রচিত্তে ভাষা শহিদদের স্মরণ করি। ❑

শিক্ষাবিদ ও গবেষক

বাংলা আমার রাজেন্দ্রাণী

শান্তা মারিয়া

বুকের ভিতর যে বাড়িতে
বসত করে দুঃখগুলো
সেই জমিনে নিশান উড়ায়
চর্যাপদের প্রাচীন ধুলো।

আরাকানের কঠিন সভায়
আলাওলের পদ্মাবতী
পয়ার সুরের লহরীতে
বাংলা আমার ভাগ্যবতী।

গহীন রাতে রবিঠাকুর
আলোক শিখা জ্বালেন প্রাণে
বিদ্রোহী বীর কবি নজরুল
ধূমকেতু আর ভাঙার গানে।

সালাম রফিক বরকতেরা
অকাতরে রক্ত দিল।
বাংলা ভাষার কীর্তিগাথা
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে গেল।

রাঢ় বঙ্গ গৌড় জুড়ে
বাংলা আমার রাজেন্দ্রাণী
সোনারগাঁও আর পুণ্ড্রধামে
এই ভাষারই অমিয়বাণী।

ভাষার মাসে ভাষা শহিদ
স্মরণ করি, সালাম জানাই
বাংলা আমার মাতৃভাষা
সারা বিশ্বে তুলনা নাই।

শহিদমিনার হাসে

হানিফ রাজা

বছর বছর অমর একুশ
যখন ফিরে আসে,
আগুনঝরা ফাগুন দেখে
শহিদমিনার হাসে।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
শহিদ হলো যারা,
ইতিহাসের পাতায় আজও
জীবিত যে তারা।

রক্ত দিয়ে কিনল তারা
বাংলা মায়ের ভাষা,
এই ভাষাতে কথা বলি
মিটাই মনের আশা।

অমর একুশ শিখিয়ে দেয়
স্বাধীনভাবে চলা,
প্রতিবাদে নাই যে আর ভয়
বাংলা ভাষায় বলা।

একুশ এলে এসো সবাই
শহিদমিনার চলি,
রক্তে রাঙা একুশ আমার
গানে গানে বলি।

গল্প

একুশের মা

এনায়েত রসুল

নদীর ওপর দিয়ে বেড়াতে যাওয়া এক মজার ব্যাপার– কথাটা অহনা প্রথম ওর ক্লাসমেট মৌয়ের কাছে শুনেছিল। মৌ বলেছিল, নদীপথে কোথাও যাওয়ার মাঝে যে কী আনন্দ লুকিয়ে থাকে, তোকে বোঝাতে পারব না। আমার তো মনে হয় এরচেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। মৌয়ের কাছে সে কথা শোনার পর থেকে নদীতে ভেসে ভেসে কোথাও যাওয়ার জন্য অহনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে আজ সে বাবার সাথে লঞ্চে চড়ে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে।

লঞ্চ যাচ্ছে নদীর বুক চিরে। নদীর দু'পাশে পাকা ধানে ভরা সোনালি ক্ষেত। তার পেছনে সবুজ গ্রাম। মাথার ওপর অসীম নীল আকাশ। সেই আকাশে তুলো তুলো মেঘ থরে থরে ভেসে বেড়াচ্ছে আর উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি– কি যে অপূর্ব লাগছে সেসব দেখতে, তা লিখে বোঝানো যাবে না!

অহনা দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ে থুতনি ছুঁইয়ে। পাশে ছিলেন বাবা। অহনা বাবাকে বলল, কী যে ভালো লাগছে বাবা! কি যে সুন্দর এই নদী, ওই গ্রাম আর দূরের ও-ই নীল আকাশ– তোমাকে বোঝাতে পারব না!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এত ভালো লাগছে!

অহনা বলল, হ্যাঁ বাবা, খু-উ-ব ভালো লাগছে! আমি মৌকে বলব, যে নদীর ওপর দিয়ে আমাদের গ্রামে যেতে হয়, তার দু'পাশে যে ফসল ভরা ক্ষেত আর সবুজ গ্রাম রয়েছে, অমন আর কোথাও নেই। তুমি বলো বাবা, আর কোথাও আছে?

বাবা বললেন, আমার তো এ দেশের সবটা দেখা হয়নি। তবে অনেকের কাছে শুনেছি, সারাটা দেশই নাকি এমন সুন্দর– সবুজে-শ্যামলে ভরপুর। নদ-নদী ছড়িয়ে আছে দেশের বুক জুড়ে। এ দেশের রূপে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অহনা বলল, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। বইয়ে পড়েছি, এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও নেই। তো বাবা, আমাদের গ্রাম আর কত দূরে?

বাবা বললেন, এসে গেছি প্রায়। আর আধঘণ্টার মতো লাগবে। তারপরই তুমি আমাদের গ্রামে পৌঁছে যাবে।

দুই.

এক সময় নদীর পাড় ঘেঁষে লঞ্চ থামল। বাবার পিছুপিছু অহনা লঞ্চ থেকে নেমে এল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এটাই আমাদের গ্রাম?

বাবা বললেন, না, এর পরেরটা। যেতে দশ মিনিট লাগবে।

: দ-শ মিনিট? এত দূরে কেন আমাদের গ্রামটা?

অহনার প্রশ্নের জবাব দিতে যাবেন, তার আগেই এক বৃদ্ধার ওপর বাবার চোখ পড়ল। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে সামনে রং-চটা একটা থালা নিয়ে বসে আছেন সেই বৃদ্ধা। আর উদাস চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাবা অহনার হাত ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ সেই হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি একুশের মা না?

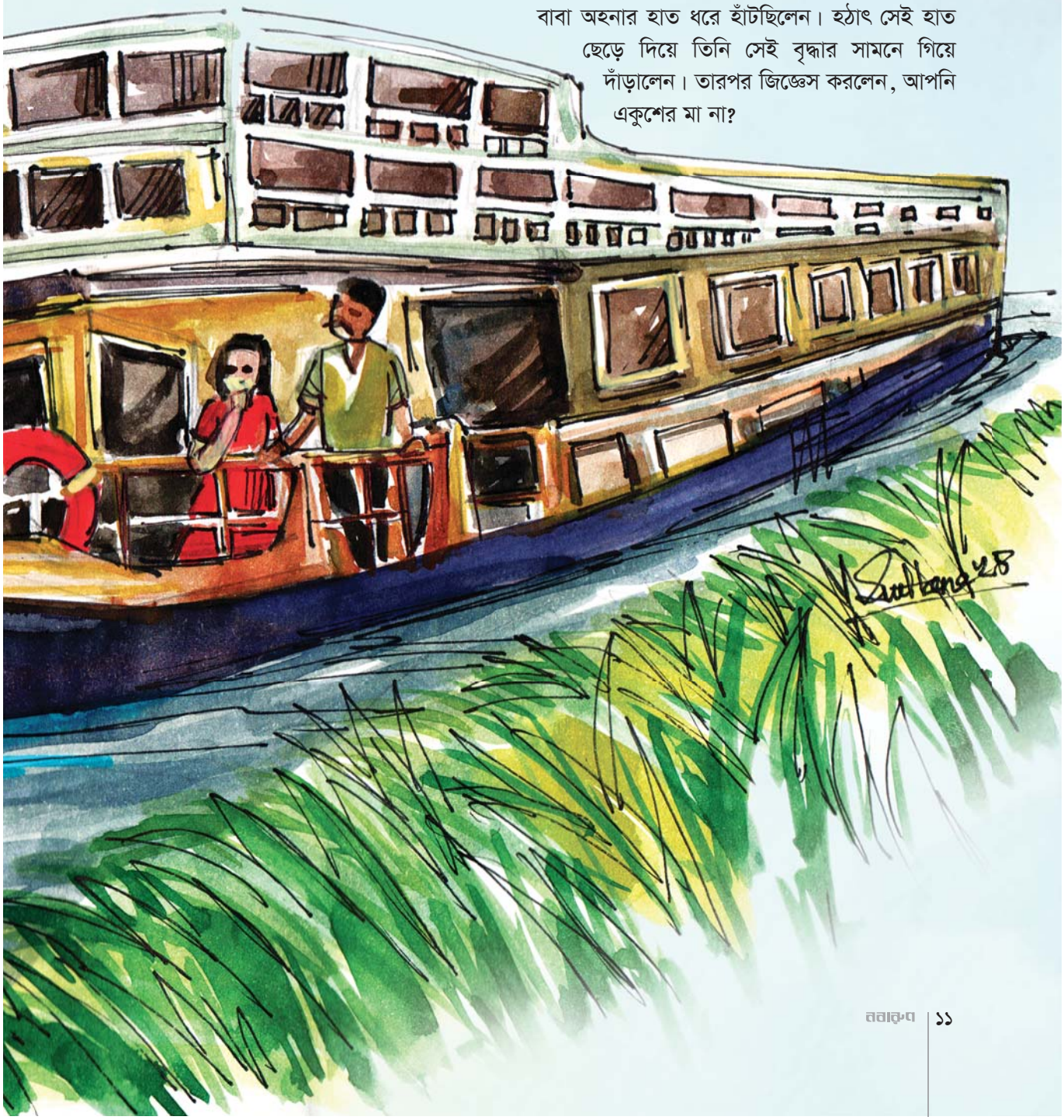

ততক্ষণে অহনাও বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। অহনা দেখল, বাবা যাকে একুশের মা বলে ডাকলেন, তিনি বাবাকে ঝট করে দেখে নিয়ে আবার নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাবার প্রশ্নের জবাব দিলেন না!

বাবার সঙ্গে বৃদ্ধার এমন আচরণ অহনার কাছে ভালো লাগল না। তাই অহনা জিজ্ঞেস করল, ইনি কে বাবা? তুমি একে প্রশ্ন করলে অথচ ইনি জবাবই দিলেন না! তুমি একে চেনো?

বাবা বললেন, হ্যাঁ মা, খুব ভালো করে চিনি। ইনি একুশের মা।

বাবা একটু ঝুঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন একুশের মা? আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি...

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই এবার ভেসে এল একুশের মায়ের খনখনে কণ্ঠস্বর– তুমি কেডা গো বাবা? কার পোলা তুমি?

কার ছেলে সে কথা বলার আগে এক অবাক করা কাণ্ড ঘটালেন বাবা। নিঃশঙ্কোচে তিনি একুশের মায়ের মুখোমুখি বসে পড়লেন। তারপর খুব নরম কণ্ঠে তার সাথে অনেক কথা বললেন। সেসব কথা শুনতে শুনতে একুশের মা বারবার চোখ মুছে চললেন। দু-চারবার বাবাও চোখ মুছলেন। নিজের ধবধবে সাদা রুমাল দিয়ে বাবা একুশের মায়ের চোখও মুছিয়ে দিলেন। তারপর কয়েকটি একশ টাকার নোট তার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বললেন, এগুলো রাখুন।

: এগুলান কী, ট্যাকা?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সামান্য কিছু টাকা।

: ট্যাকা দিয়া আমি কী করুম?

যেন টাকার ব্যবহার জানেন না, এমন করে প্রশ্ন করলেন একুশের মা। বাবা বললেন, যখন যা ইচ্ছে হয় তা কিনে খাবেন আর একটা কাপড় কিনে নেবেন। আপনার এই কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে।

বাবার কথা শুনে একুশের মা ম্লান হাসলেন। পরক্ষণেই আঁচলের গিট খুলে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন আর কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। আর যে কাপড় পইরা আছি, এইটা দিয়াই আমার জীবন কাইট্টা যাইব। নেও বাবা, তোমার ট্যাকা তুমি ফিরাইয়া নেও।

বাবা টাকাগুলো আবার আঁচলে বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই গ্রামের বাড়িতে আসা হয় না, আপনার খোঁজখবরও নেওয়া হয়ে ওঠে না। এখন থেকে মাঝে মাঝে এসে আপনাকে দেখে যাবো।

: আইস্যা দেইখ্যা যাইবা? কিয়ারে এমুন কথা কও বাবা? কতজনই তো এমন কথা কইয়া আর ফিরা আসে নাই। আমিও আর কাউর পথ চাইয়া বইস্যা থাকুম না।

বাবা বললেন, কেউ না আসলেও আমি আসব– অবশ্যই আসব। এটা আমার মেয়ে অহনা। ওকে দোয়া করুন।

একুশের মা ঘোলা চোখে অহনার দিকে তাকালেন। তারপর কাঁপা কাঁপা হাত তুলে ওকে কাছে ডাকলেন। অহনা এগিয়ে গিয়ে একুশের মায়ের সামনে বসল। তিনি অহনার মাথায় হাত রেখে কী যেন বললেন ঠিক বোঝা গেল না। তারপর উদাস চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিন.

কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবা বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। যেতে যেতে অহনা জিজ্ঞেস করল, এই যে একুশের মা, তার কি একুশ নামে কোনো ছেলে ছিল?

বাবা বললেন, একুশ নয়– ইয়াকুব নামে এক ছেলে ছিল। এই বেচারি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে দিয়ে যে রোজগার করতেন, তা দিয়ে ছেলেকে ঢাকায় রেখে পড়াশোনা করাতেন। তখন সারা দেশে যে ভাষা আন্দোলনের জোয়ার বইছিল, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে ছাত্র-জনতা যে মিছিল বের করেছিল, ইয়াকুবও তার একটাতে অংশ নিয়েছিল। ওদের মিছিলটি নিমতলীর কাছাকাছি যেতেই পুলিশ বাহিনী ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ইয়াকুব শহিদ হয়। সেই থেকে ইয়াকুবের মায়ের নাম হয়ে যায় একুশে শহিদের মা–

শেষে তা হয়ে দাঁড়ায় শুধু একুশের মা।

: তার মানে, এই বেচারির ছেলে ইয়াকুব একজন ভাষা সৈনিক?

: হ্যাঁ।

: তাই যদি হবে, তাহলে আমরা তার নাম জানি না কেন? কোনো বইতেও তার নাম লেখা নেই! কেন তার নাম নেই বাবা?

অপার জিজ্ঞাসা নিয়ে অহনা বাবার দিকে তাকালো।

বাবা বললেন, প্রথম দিকে আশপাশের গ্রামের অনেকেই তার খোঁজখবর নিত। সাহায্য-সহযোগিতা করত। ধীরে ধীরে সময় বদলে গেছে। মানুষজন শহরমুখী হয়েছে। জীবন অন্যরকম হয়ে গেছে। মানুষের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। এসব কারণে এখন আর কেউ তার খোঁজখবর নেয় না।

অহনা বলল, কেউ না নিক বাবা, তুমি আর আমি খোঁজখবর নেবো। যত দিন একুশের মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমরাই তার দেখাশোনা করব। তুমি পারবে না বাবা? বলো, পারবে না একটু খোঁজখবর নিতে?

বাবা বললেন, তুই পাশে থাকলে আমি সব পারব।

বাবার কথা শুনে অহনার চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল। খুশিতে উছল হয়ে অহনা কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই বাবা বললেন, এই যে আমরা এসে গেছি।

অহনা দেখল ওরা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

১৯৫২ থেকে ২০২৪

আমি ও আমার অনুজেরা

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

আমাদের সুনাম আছে– আমরা বাঙালি বীরের জাতি, যার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সংকটে দিয়ে এসেছি। যেমন–১৯৫২ সালে আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে

প্রাণ দিয়ে আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন। এতেও আপামর জনতা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। জনতার অধিকার আদায় করার প্রয়াসে আমাদের শিশু-কিশোরেরাও কখনো পিছপা হয়নি; জনগণের পাশাপাশি এ সংগ্রামে কবি-সাহিত্যিকরাও নিশ্চুপ থাকেননি। আমি নিজেও অনেক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। আমার সৌভাগ্য আমি '৬৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে '৭০ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম।

ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদমিনার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে আসাদ হত্যার প্রতিবাদে আমরা সব শ্রেণির শিক্ষার্থী আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে ঢাকায় দীর্ঘতম মিছিল করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মিছিল শুরুর জায়গায় ফিরে মিছিল শেষ করেছি আমরা সেদিন। তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার অফিসের সামনে দিয়ে আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় কবি শামসুর রাহমান 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি লিখেন। তিনি তখন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরে আমরা টিএসসি থেকে বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে খালি পায়ে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার পর্যন্ত মৌন মিছিল করেছি। আজকের 'আসাদ গেট' তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের নামানুসারে 'আইয়ুব গেট' ছিল। এ ঘটনার পরে শহিদ আসাদকে অমর করে রাখতে 'আসাদ গেট' নামকরণ করা হয়।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশে কোনো ছাত্র আন্দোলন আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। এভাবেই সকলের অংশগ্রহণে চলেছে আমাদের অধিকার আদায়ের সক্রিয় আন্দোলন। এসব আন্দোলনে প্রাণ দিতে থেমে থাকেনি শিশু-কিশোরেরাও। যার সর্বশেষ প্রমাণ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনেও হাজারের উপর ছাত্র, শিশু-কিশোরসহ

সব শ্রেণির মানুষ শহিদ হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন আরো অনেক বেশি। এমন বিরল ঘটনা বিশ্বের খুব কম দেশেই খুঁজে পাওয়া যায়।

এখন নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা অটল। আমি নিশ্চিত এ দেশ বিনির্মাণে শিশু-কিশোরসহ আমার সকল অনুজ যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আমি আন্দোলনে সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত এবং যারা আহত হয়েছেন, তাদের সুস্থতা কামনা করছি। আশা করছি– বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে আমরা সফল হবো, সার্থক হবে আমাদের সকল ত্যাগ আর অবসান হবে সকল তিতিক্ষার। ❑

কবি ও প্রাবন্ধিক

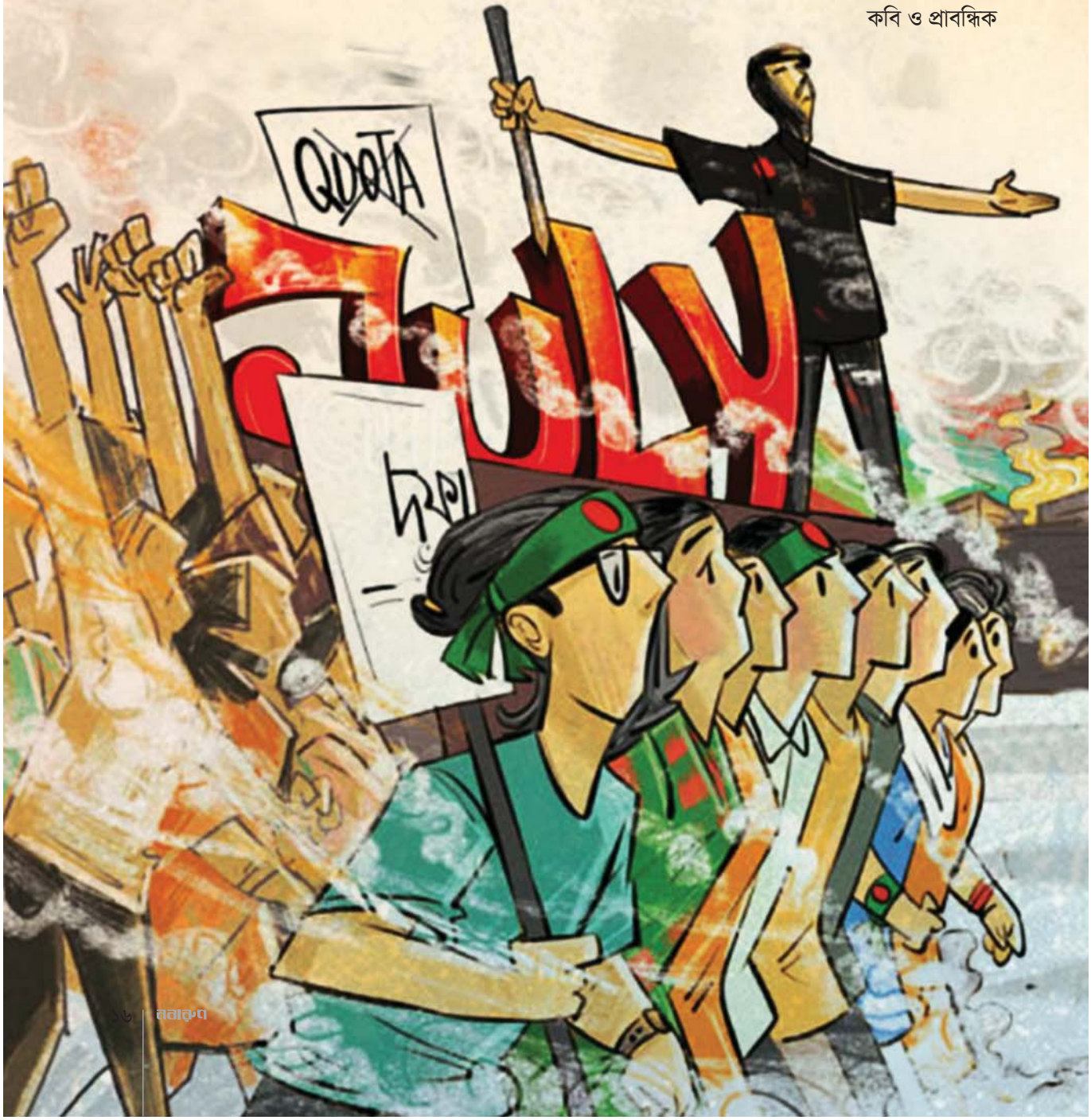

আমার একুশ

তাহমিদ হাসান

একদিন তুমি ছিলে পরাধীন
জননী আমার প্রিয় মাতৃভাষা;
মেলে না বিজয় বেদনা-বিহীন
রক্তের স্রোত মনে জ্বালে আশা।

মিছিলের রং কৃষ্ণচূড়ায়
ঝরে গেছে ফুল গুলির আঘাতে;
শহিদের দান ভোলা নাহি যায়
বিজয়-মশাল আমাদের হাতে।

দেশের সকল শহিদের নাম
লেখা আছে বুকে সোনার অক্ষরে;
বরকত আর রফিক, সালাম
যেন ফিরে আসে একুশের ভোরে।

নিয়েছি শপথ শহিদমিনারে
হারাবো না পথ আসে যদি ঝড়;
সীমাহীন শোক মনের কিনারে
তবুও প্রবল মিছিলের স্বর।

অনেক আগুন ঝরালো ফাগুন
আমার শেকড় জানি ফেব্রুয়ারি;
পাখি গান গায় সুরে গুনগুন
'আমি কি তোমায় ভুলে যেতে পারি!'

একুশ

আহসানুল হক

একুশ আমার রাষ্ট্রভাষা
সত্য জয়ের সুর
একুশ আমার ভালোবাসা
প্রকাশ সুমধুর !

একুশ আমার জাতিসত্ত্বার
গভীর অহংকার
একুশ আমার স্বাধীনতার
উন্মোচিত দ্বার !

একুশ আমার শহিদমিনার
বর্ণমালার শোক
একুশ সবার হৃদয় বীণার
ঝংকৃত সুর হোক !

ভাষা আন্দোলন

সাঈদুর রহমান লিটন

বাংলার এক ছোট্ট গ্রামে এক বাবা, মা আর তাদের ছোট্ট মেয়ে শারমিন একসঙ্গে থাকতেন। শারমিন ছিল খুবই মিষ্টি মেয়ে। তার একটা স্বভাব দোষ ছিল সে সবকিছু জানতে চাইত। একদিন তার বড়ো ভাইয়ার কাছে একটা প্রশ্ন তুলল।

ভাইয়া, আন্দোলন কী?

ভাইয়া একটু চিন্তা করেই উত্তর দিল, আন্দোলন হলো যখন মানুষ তাদের অধিকার চাইতে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করে। মিছিল, সভা কিংবা কোনো বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবি জানায়।

শারমিন আবার প্রশ্ন করল, তাহলে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য কি আন্দোলন হয়েছিল?

ভাইয়া এবার একটু বেশি সময় নিয়ে বলল, হ্যাঁ, শানু, একদম ঠিক বলেছ। এটা ছিল একটি বড়ো ঘটনা, আমাদের ইতিহাসের এক অংশ। তুমি তো জানো, অনেক আগে আমাদের দেশটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। তারপর পাকিস্তান তৈরি হলে পাকিস্তান সরকার বাংলার মানুষদের কাছে 'উর্দু' ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করবে না, শুধুমাত্র উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বাংলার মানুষ যারা তাদের ভাষাকে ভালোবাসত, তারা কখনোই এটা মেনে নেননি।

শারমিনের ভাইয়া শারমিনকে আদর করে শানু ডাকে।

শারমিন কিছুটা বিস্মিত হয়ে শোনে, তাহলে কী হয়েছিল?

ভাইয়া বলল, বাংলার মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই প্রতিবাদে অংশ নেয়। তারা শান্তিপূর্ণভাবে বাংলা ভাষার অধিকার চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তখন তাদের ওপর গুলি চালায়। সেই দিন অনেক ছাত্র শহিদ হন। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। শারমিন শুনে থমকে যায়। ওই তো ভাইয়া! এত বড়ো ঘটনা, আমি জানতাম না।

ভাইয়া মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, শানু। আমাদের ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি, এগুলোই আমাদের অস্তিত্ব। সেই আন্দোলনের জন্যই আজ আমরা মুক্তভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি।

শারমিন তখন কিছুটা ভাবতে থাকে তারপর বলল, আচ্ছা ভাইয়া তাহলে তো আমাদের ভাষার জন্য যারা আন্দোলন করেছিলেন তারা অনেক বড়ো কাজ করেছেন।

ভাইয়া হেসে বলে, এই সংগ্রাম অনেক মানুষের। আমাদের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা জানানো সবচেয়ে বড়ো কাজ। তবে আমাদেরও দায়িত্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখা।

শারমিন চুপচাপ শুনতে থাকে, তারপর বলল, তাহলে আমি আরেকটা কাজ করতে চাই ভাইয়া। আমি বাংলা ভাষা নিয়ে আরও বেশি পড়াশোনা করব এবং বাংলায় কথা বলব।

ভাইয়া খুব খুশি হয়ে বলে, তোমার এই চিন্তা অনেক ভালো, শানু! তুমি যখন বড়ো হবে তখন তোমার মতো আরো অনেক মানুষ আমাদের ভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখাবে।

শারমিন সেদিন ঠিক করেছিল সে তার ভাষাকে আরো ভালো করে শিখবে এবং সবসময় বাংলায় কথা বলবে, কারণ বাংলা ভাষা তার হৃদয়ের ভাষা, আর এই ভাষার জন্য অনেক সংগ্রাম হয়েছিল। ❑

প্রাবন্ধিক

গল্প

শহিদমিনারের কিশোরেরা

বিচিত্র কুমার

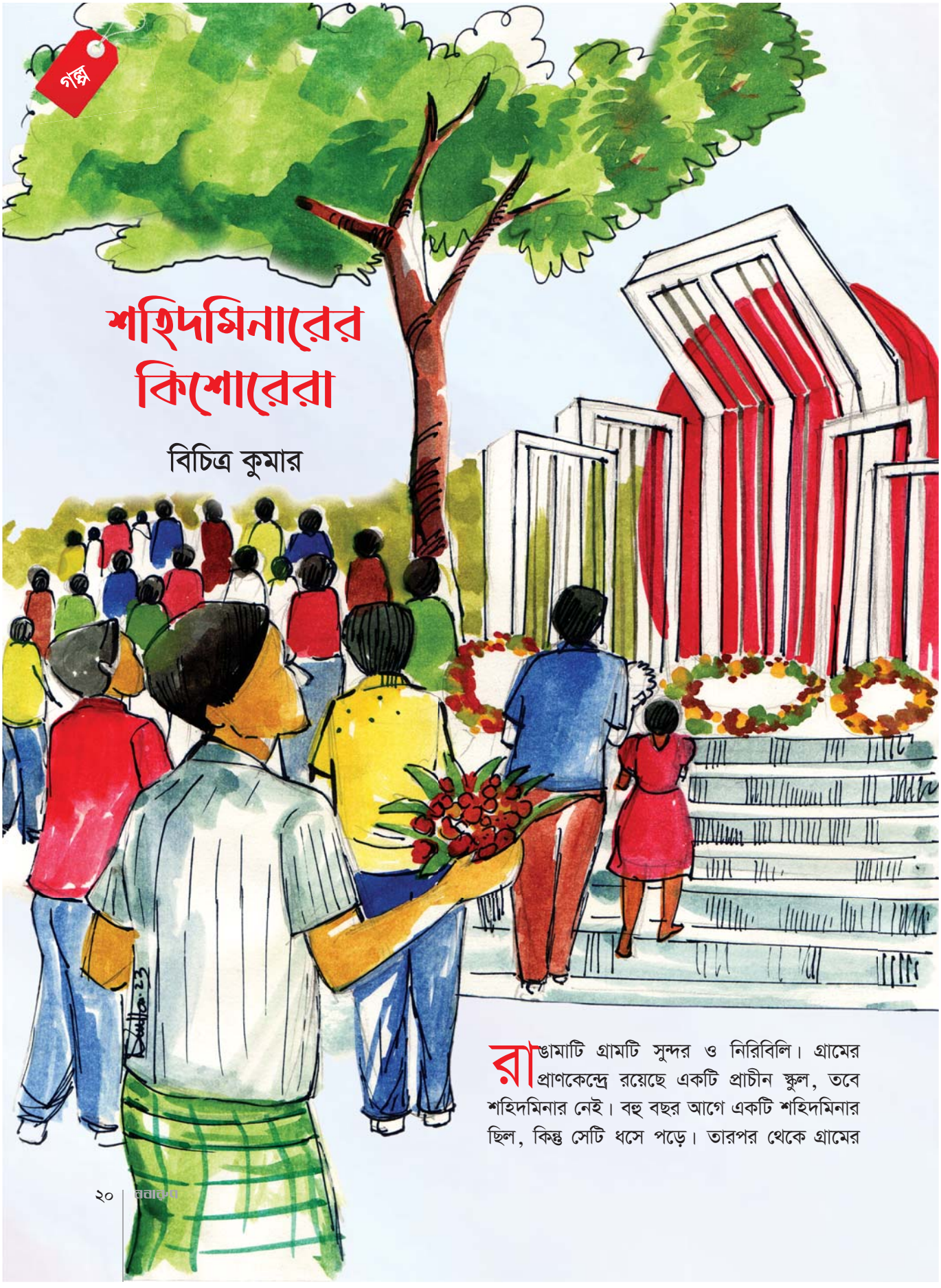

রাঙামাটি গ্রামটি সুন্দর ও নিরিবিলি। গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রাচীন স্কুল, তবে শহিদমিনার নেই। বহু বছর আগে একটি শহিদমিনার ছিল, কিন্তু সেটি ধসে পড়ে। তারপর থেকে গ্রামের

মানুষ অমর একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য শহরে যায়। তবে এবার গ্রামের কিশোরেরা একটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়।

রনি, সজল, পলাশ ও তাদের বন্ধুরা স্কুলের শহিদমিনার ভেঙে পড়ার কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নিজেরাই একটি নতুন শহিদমিনার বানাবে। তাদের এই ভাবনা শুরু হয় মাস্টারমশাইয়ের একটি গল্প থেকে। ক্লাসে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলছিলেন- সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার কীভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বাংলার জন্য। তাদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাতে শহিদমিনার একটি প্রতীক। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ' শহিদমিনার শুধু একটি কাঠামো নয়, এটি ভাষার প্রতি ভালোবাসা আর আত্মপরিচয়ের প্রতীক।'

এই কথাগুলো রনির মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সে ভাবল, 'শহিদমিনার আমাদের গ্রামেও থাকা উচিত। শহরের ওপর নির্ভর না করে আমাদের নিজের গ্রামে নিজস্ব শহিদমিনার বানাতে হবে।'

পরদিন বিকেলে রনি ও তার বন্ধুরা মিলে বসে। সজল বলে, 'আমাদের পরিকল্পনা সফল করতে হলে সবাইকে কাজ ভাগ করে নিতে হবে। তবে গ্রামের বড়োরা হয়ত আপত্তি করতে পারেন। তাই আমরা রাতেই কাজ করব।' পলাশ যোগ করল, 'তাহলে আমাদের যা যা দরকার, তা আগে যোগাড় করতে হবে।'

পরিকল্পনা শুরু হয়। পলাশ আর রাকিব বাঁশ ও কাঠ সংগ্রহ করে। সজল মাটি নিয়ে আসে। রনি স্কুলের পুরনো স্টোরঘর থেকে রং আর অন্যান্য জিনিসপত্র খুঁজে বের করে। মেয়ে বন্ধুরা, পলি ও সুমি, সবাইকে চা-নাশতার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেয়।

রাত গভীর হলে তারা কাজে নেমে পড়ে। প্রথমে বাঁশ দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়। কাঠামোর চারপাশ মাটি দিয়ে মোড়া হয়, যাতে সেটি শক্তপোক্ত হয়। এরপরে সবাই মিলে কাঠামোটিকে সাদা রং করে। সাদা রঙের মাঝে লাল কাপড় দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করা হয়, যা শহিদমিনারের কেন্দ্রবিন্দু।

পুরো কাজ শেষ করতে করতে রাত কেটে যায়। সকালের প্রথম আলো ফুটতেই তাদের তৈরি শহিদমিনারটি দাঁড়িয়ে যায়। সবাই ক্লান্ত হলেও মনে ছিল অসীম আনন্দ।

২১শে ফেব্রুয়ারির সকালে গ্রামের মানুষ এই নতুন শহিদমিনার দেখে হতবাক হয়ে যায়। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিশোরদের হাতেই এটি তৈরি হয়েছে। স্কুলের মাঠে শহিদমিনার দেখে আবেগে আপ্লুত হয় সবাই।

গ্রামের প্রবীণ আবুল হোসেন দাদু এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা আমাদের জন্য যা করেছ, তা আমরা কখনো ভুলব না। তোমাদের মতো সাহসী ও একতাবদ্ধ কিশোরেরা ভবিষ্যতে দেশের জন্য বড়ো কিছু করবে।'

রনি শহিদমিনারের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলল, 'আমরা চেয়েছি, আমাদের গ্রামেও ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হোক। এই শহিদমিনার শুধু একটি কাঠামো নয়; এটি আমাদের একতা ও ভালোবাসার প্রতীক।'

গ্রামের মানুষ শহিদমিনারের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালো। বাচ্চারা হাতে তৈরি কাগজের ফুল নিয়ে এল। সবাই একসঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইল। পুরো আয়োজনটি গ্রামে এক নতুন বার্তা বয়ে আনল।

গ্রামের মানুষ এবার বুঝল, ভাষার প্রতি ভালোবাসা কেবল বড়োদের কাজ নয়। ছোটোদের ইচ্ছাশক্তি আর উদ্যোগেও বড়ো কিছু সম্ভব। শহিদমিনার শুধু ভাষার প্রতীক নয়, এটি প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মের সংযোগ।

পরের বছর থেকে গ্রামের স্কুলেই একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান শুরু হলো। কবিতা আবৃত্তি, গান, ভাষা শহিদদের নিয়ে নাটক সব আয়োজনেই কিশোরদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিশোরদের তৈরি সেই শহিদমিনার গ্রামের মানুষের জন্য গর্বের প্রতীক হয়ে উঠল।

রনি, সজল, পলাশ ও তাদের বন্ধুরা প্রমাণ করল, একসঙ্গে কাজ করলে অসম্ভব কিছু নেই। তাদের উদ্যোগ কেবল একটি শহিদমিনার নয়, বরং গ্রামের মানুষের মনেও একতা আর ভালোবাসার মিনার তৈরি করল। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

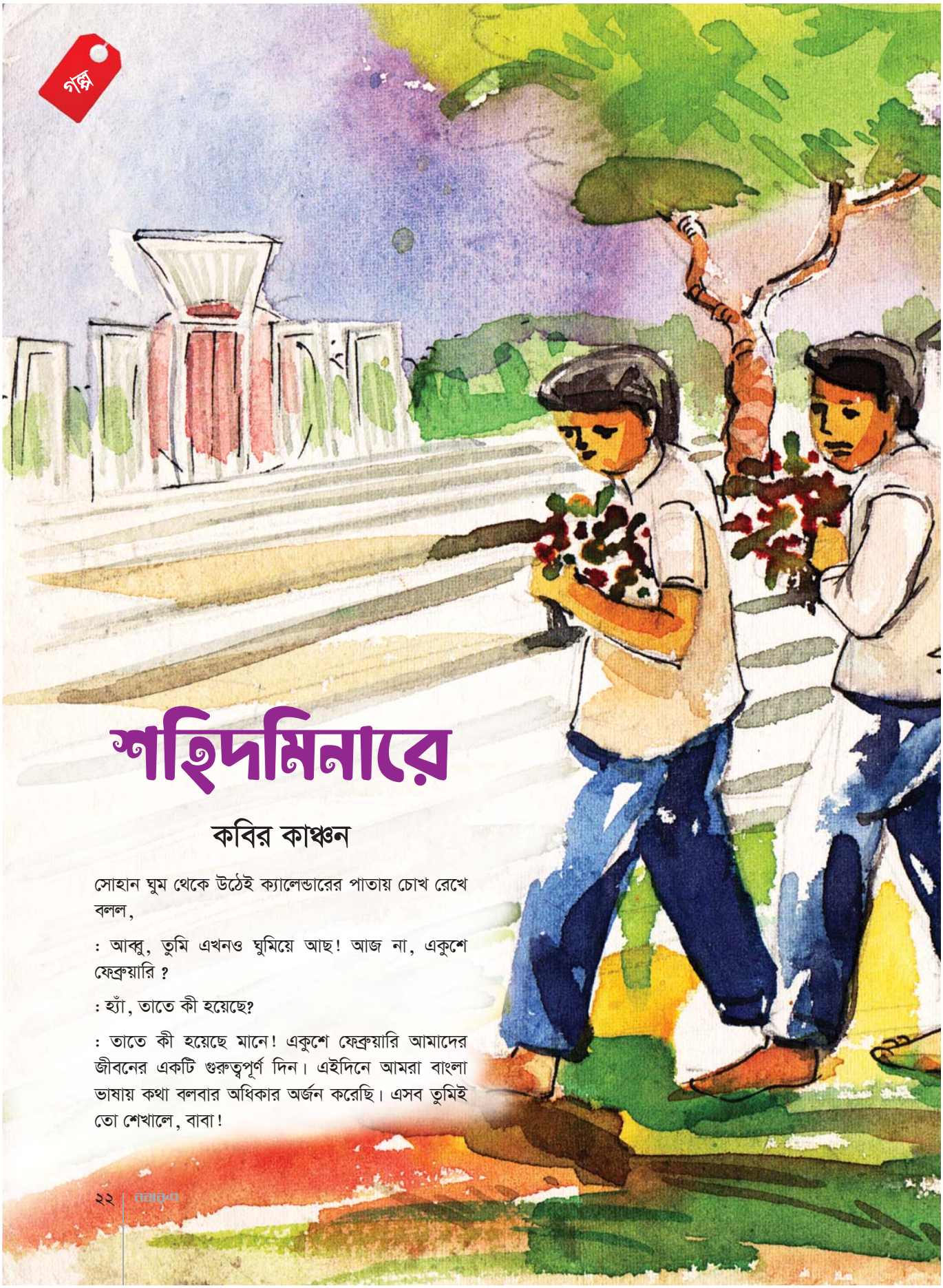

শহিদমিনারে

কবির কাঞ্চন

সোহান ঘুম থেকে উঠেই ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ রেখে বলল,

: আব্বু, তুমি এখনও ঘুমিয়ে আছ! আজ না, একুশে ফেব্রুয়ারি ?

: হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

: তাতে কী হয়েছে মানে! একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এইদিনে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলবার অধিকার অর্জন করেছি। এসব তুমিই তো শেখালে, বাবা!

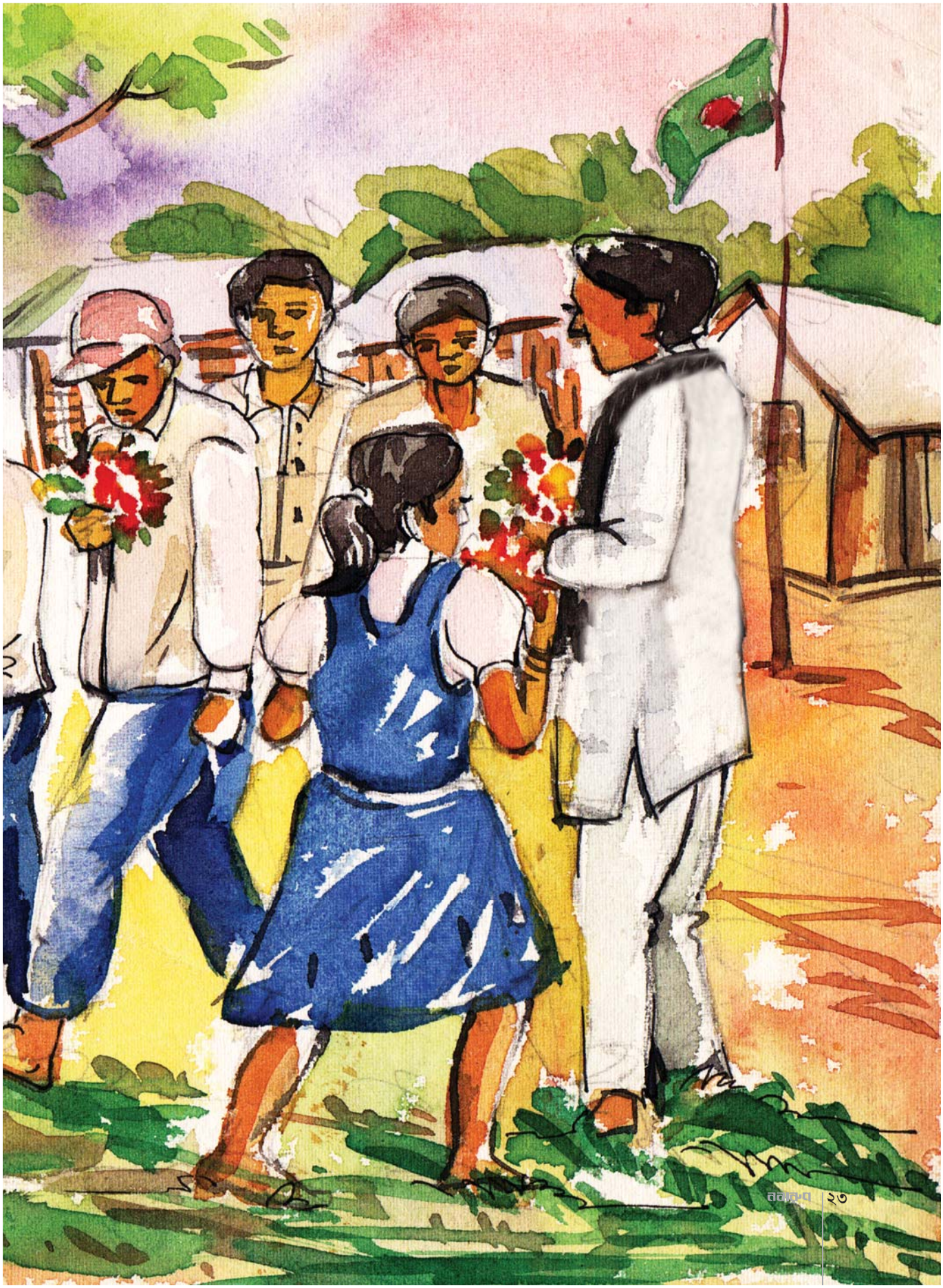

: হ্যাঁ, ঠিকই তো।

: তাহলে অবাক হলে যে!

: অবাক হয়েছি তোমার কৌতূহল দেখে। প্রভাতফেরি শুরু হবে সকাল আটটায়। এখন তো মাত্র ছয়টা পনেরো বাজে। আরেকটু ঘুমিয়ে নাও। স্কুলে যাবার সময় আজ তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাব।

: তুমি ঘুমাও, আব্বু। আমার ঘুমালে চলবে না।

ছেলের কথায় ইকবাল চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন,

: তুমি এখন কী করবে?

: আমি বাজারের দিকে যাব। ওখানে আমার জন্য আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

: যাও, কিন্তু একটু পরই চলে আসবে। মনে রেখো, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। এই 'একুশ' আমাদের অহংকার। এইদিনকে কোনোমতেই ভুলে যাওয়া যাবে না। আজ আমরা একসাথে ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানাবো।

: ভুলে যাব কেন আব্বু? আমরা বাঙালি! সব মাস ভুলতে পারি; ফেব্রুয়ারি মাসকে কেমন করে ভুলি? এই মাসেই তো আমাদের স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল। আর আজ কিন্তু আমি শিক্ষকের ছেলে হিসেবে শহিদমিনারে ফুল দিতে যাব না। যাব অন্যভাবে।

: বাহ! দারুণ বলেছ। কিন্তু বাবা, এত সুন্দর করে ফেব্রুয়ারি মাসের কথা কীভাবে জানলে?

: তুমি আমাদের স্কুলের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিক্ষক হারুনুর রশিদ স্যারের কথা শোনোনি! স্যার আমাদের সামনে যখন যেটা পড়ান তখন সেটা সেখানেই আমাদের শেখা হয়ে যায়।

গতকাল কী চমৎকার করে স্যার আমাদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বুঝিয়েছেন! আমার এখনও মনে আছে।

: তুমি কী সব বুঝতে পেরেছ?

: হ্যাঁ, পেরেছি।

: ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, তুমি আরেকটা কথা বলেছিলে, অন্যভাবে। এর মানে কী?

: ওটা এখন বলব না। সময়মতো শহিদমিনারেই দেখা হবে, আব্বু। তখন বুঝবে।

: আরেকটু ঘুমিয়ে নাও, বাবা।

: না, তুমি ঘুমাও। আমাকে দুইশ টাকা দাও না, আব্বু?

: দুইশ টাকা দিয়ে তুমি কী করবে?

: আমার লাগবে।

সোহানের মুখের দিকে তাকিয়ে ইকবাল চৌধুরী হাসিমাখা মুখে বললেন,

: এই নাও, বাবা। এখনই যাবে?

: হ্যাঁ, আব্বু। আমি আসছি।

একথা বলে সোহান কুয়াশায় ঢাকা ভোরে ঘরের বাইরে পা বাড়ালো।

বড়ো বড়ো পায়ে হেঁটে বাজারের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এসে 'পুষ্পালয়'-এ ঢুকল সে। আগে থেকে সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে মিলি, কাইফ ও অনিলা।

সোহানকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে কাইফ বলল,

: কীরে সোহান, এই শীতের মধ্যে খালি পায়ে চলে এলি যে!

কাইফের কথায় নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সোহান জবাব দিল,

: উফ! জুতা পরতে ভুলে গেছি। থাক ওসব। এখন বল, আমাদের আজকের প্রোগ্রামের কী খবর? হাতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেই।

পাশ থেকে অনিলা বলল,

: আমরা তো সবাই এসে গেছি। সোহান, তোর এত দেরি হলো কেন রে?

: আর বলিস না, গতরাতে আব্বু একটু দেরি করে ঘুমিয়েছেন। ফজরের নামাজ আদায় করার পর থেকে আব্বুর সাথে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেছে।

পাশ থেকে মিলি বলল,

: তুই সৌভাগ্যবান! তোর বাবা খুব সচেতন একজন মানুষ। একজন ভালো শিক্ষকও। তুই তো তোর বাবার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারিস।

: তা ঠিক বলেছিস।

কাইফ বলে উঠল,

: তোদের কথা কী শেষ হয়েছে?

সোহান ও অনিলা একসাথে বলল,

: হ্যাঁ, বন্ধু।

: তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে তোরা আশপাশের পথশিশুদের এখানে এনে সমবেত কর। পুষ্পমাল্য সাজানোর কাজ প্রায় শেষের দিকে। আমি এদিকটায় খেয়াল করছি। আর হ্যাঁ, আমাদের ফান্ডের জন্য দুইশ টাকা করে আনবার কথা ছিল। তোরা কী তা এনেছিস? আনলে আমার কাছে জমা দে।

সোহান, মিলি ও অনিলা কাইফের কাছে দুইশ টাকা করে জমা দিল। কাইফ নিজের থেকে দুইশ টাকা নিয়ে ওদের টাকার সাথে মিলিয়ে হিসাব করতে করতে বলল,

: এখানে মোট আটশ টাকা হলো। আশা করি, এতেই আমাদের হয়ে যাবে। তোরা বাইরে গিয়ে আমাদের আজকের মেহমানদের নিয়ে আয়। এই ফাঁকে আমি সবার জন্য নাশতা নিয়ে আসি।

মিলি সোহান ও অনিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

: চল, আমরা একেকজন একেক দিকে গিয়ে পথশিশুদের সংগ্রহ করি।

: আচ্ছা।

এরপর সোহান, মিলি ও অনিলা পাশের বস্তি ও পথের ধারের টোকাইদের নিয়ে এসে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে লাগল। একটু পর তাদের সবার হাতে সকালের নাশতা তুলে দেয় কাইফ। তারা খুব মজা করে খায়। ঘড়িতে তখন সকাল ৭টা বেজে ৫৫ মিনিট। আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মতো সময় বাকি আছে। স্কুলের শহিদমিনারে পৌঁছাতে তাদের পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

সোহানরা পুষ্পমাল্য নিয়ে মিছিল করে স্কুলের দিকে এগুতে লাগল। মুহূর্তে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে আশপাশের এলাকা।

শহিদমিনারের কাছে এসে সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে তারা। সোহান একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করে স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান শিক্ষক শহিদমিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। দূর থেকে নিজের বাবাকে দেখে সোহানের ভালো লাগে। সে আবার মিছিলে ফিরে আসে। পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর স্কুলের দলটি সরে যেতে লাগল। ততক্ষণে সোহানরা পুষ্পমাল্য হাতে শহিদমিনারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে ইকবাল চৌধুরী মিছিলের দিকে লক্ষ্য করেন। সোহানরা শহিদমিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে চারিদিক থেকে ধ্বনিত হতে লাগল,

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।' ❑

সহকারী প্রধান শিক্ষক, জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নোয়াখালী

গল্প

একুশের ভিনজগত

কামাল হোসাইন

‘সোহান, সোহান!’

‘সোহান কি ঘুমাচ্ছো?’

গভীর ঘুমে অচেতন ছিল সোহান। রাত শেষ হয়নি তখনো। এতক্ষণ সে কী মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখছিল! স্বপ্নটার মাঝপথে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় খানিকটা বিরক্তই হলো সোহান। সুন্দর স্বপ্নের পরিসমাপ্তি না ঘটলে যেমন খারাপ লাগে, একইভাবে ভয়ংকর স্বপ্ন তা ক্ষণিকের হলেও শরীরে কেমন একটা অসাড়তা সৃষ্টি করে।

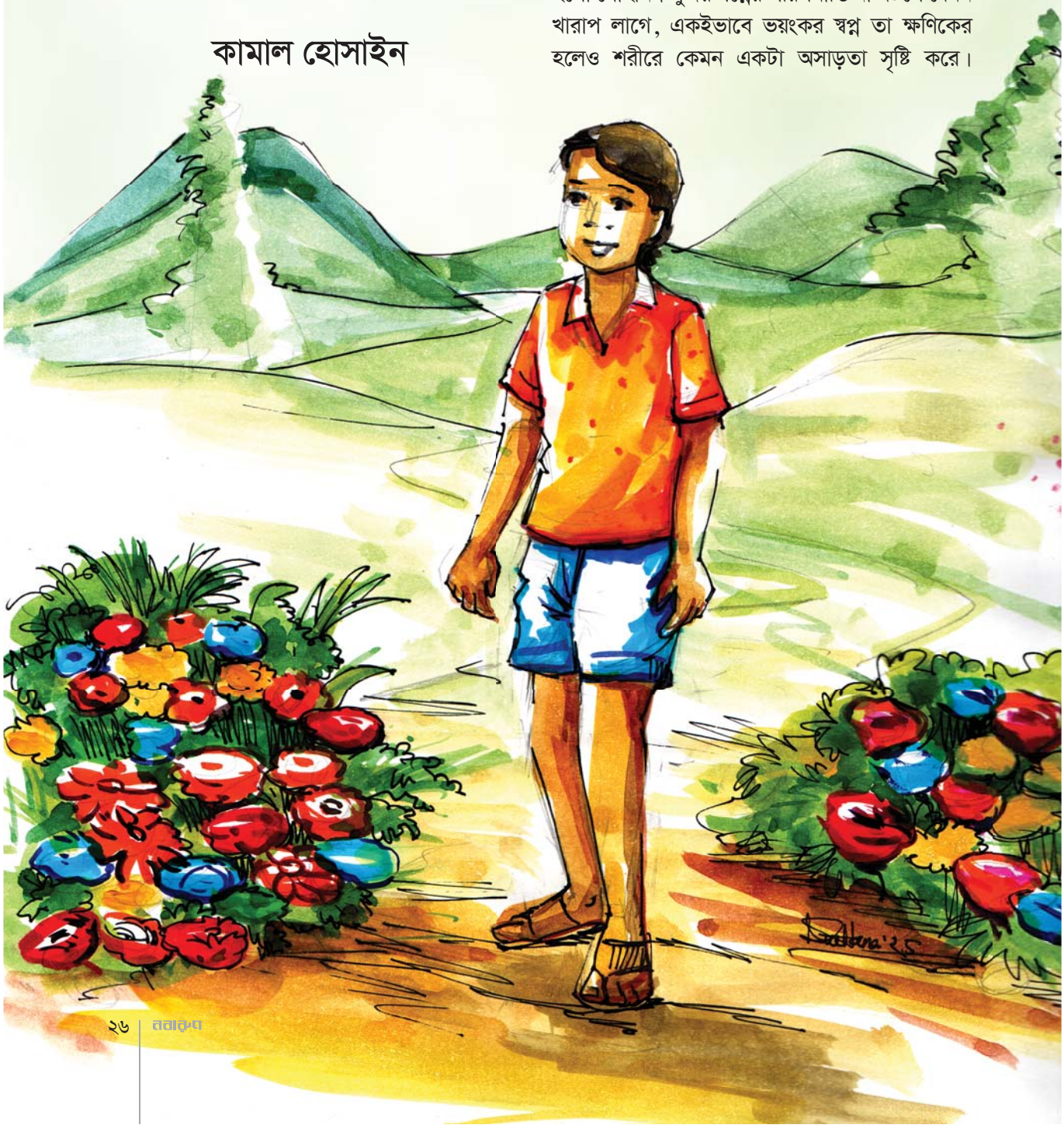

ভয়ে কখনো কখনো মনটাই কুঁকড়ে যায়। সেই রাতে পুনরায় ঘুমের নাগাল পেতে অনেক বেগ পেতে হয়।

বইপাগল সোহান কদিন ধরে অসুস্থ। বই পড়তে ও ভীষণ ভালোবাসে। অসুস্থতাও ওকে বই পাঠে বিরত রাখতে পারেনি।

সেদিনও ঘুমানোর আগে একটা মজার গল্পের বই পড়ছিল। গল্পের মূল চরিত্র শান্তামনি। হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় সে। কোথায় যায়, জায়গার নাম, কীভাবে যায় কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সে উধাও হয়ে যায়। ওই সময়টাতে সারা এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায় না তাকে।

মজার ব্যাপার হলো, এই হারিয়ে যাওয়াতে কোনো খারাপ লাগা কাজ করে না শান্তামনির। বরং বেশ ভালোই লাগে তার।

যখন সে হারিয়ে যায়, প্রতিবার ফিরে এসে নতুন নতুন বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দেয় শান্তামনি। তার এই অনেকটা আজগুবি ধরনের বয়ান শুনে বাড়ির সবাই রীতিমতো টাসকি খেয়ে যায়।

আর যে গল্প সে ফিরে এসে বলে, সেগুলো শুনতে অবশ্য কারোর খারাপও লাগে না। বিচিত্র সেই জগতে, নতুন নতুন পরিবেশে ঘুরে-ফিরে, নেচে-গেয়ে, সুস্বাদু সব খাবার খেয়ে শান্তামনির প্রস্থান ঘটে সেই জগৎ থেকে।

আরেকটা ব্যাপার তাজ্জব হবার বিষয়, তা হলো, সে যখন হারায়, ঠিক ওই মুহূর্তে কেউই তাকে দেখতে পায় না। চোখের পলকে নিরুদ্দেশ। বাড়ির অনেকেই চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু কোনোভাবেই তার হদিস পায়নি।

আজ সোহানও কি হারিয়ে গেল শান্তামনির মতো? হঠাৎ নিজেকে একটা অপরিচিত জায়গায় আবিষ্কার করল সে। কদিন ধরে অসুস্থ হলেও এখন সে নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ মনে করল। সব অসুস্থতা কোথায় যেন উবে গেছে নিমেষে! নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছে।

অচেনা-অজানা জায়গা হলেও অসম্ভব সুন্দর তার পরিবেশ। ওর মনে হলো পৃথিবীর কোনো জায়গা এটা হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই অন্য এক জগৎ। যে জগতে শুধুই ভালো। মন্দের কোনো স্থান নেই এখানে। আরো একটা ভালো ব্যাপার হলো অজানা-অচেনা জায়গা হলেও সোহানের অস্বস্তি বা ভয় কোনোটাই লাগছে না। কেন যেন এই পরিবেশ তার কাছে নিরাপদ একটা জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

এখানকার চারপাশ সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। সেই সবুজের মাঝে চমৎকার চমৎকার সব ফুলের সমাহার। কত ফুল! কোনো কোনো ফুল সে জীবনে চোখেও দেখেনি। চোখ জুড়োনো ছোটো ছোটো গাছে অচেনা সব পাখির আনাগোনা। তাদের বিচিত্র কলকাকলি সোহানের মন ভরে দিল। কিন্তু এখানে কোনো মানুষকে দেখা যাচ্ছে না! তাহলে এখানকার বাসিন্দা কারা? পরিপাটি করে সাজানো এই জগৎ কি শুধুই পাখিদের জন্য? কে জানে! হতেও পারে। এর মাঝেই কে যেন বলে উঠল, 'ফুল নেবে গো, ফুল।'

সোহান চমকে উঠল। থমকে দাঁড়ালো। কে কথা বলল? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছে না সে। অপেক্ষা করল খানিকটা, কেউ বেরিয়ে আসে কিনা। নাহ, কেউ এল না। তাহলে পাখিদের কেউ? হতেও পারে।

তাই বলে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? না। সোহান যেহেতু এখানে এসেই পড়েছে, সেহেতু জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখতে চায় ও। একথা ভেবে সামনে পা বাড়ালো। সে আরও খেয়াল করল, সে হাঁটছে বটে, কিন্তু পা যেন তার মাটি স্পর্শ করছে না। যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে! আশ্চর্য! বিস্ময় তাকে আবারও ঘিরে ধরল। সামনে তার জন্য আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে, কে জানে!

ভাবছে আর পথ চলছে সোহান। অল্প কিছু পথ অতিক্রম করতেই সামনে এল আরেকটা পাহাড়। একটা নয়, সারি সারি কয়েকটা। সেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চেনা-অচেনা নানা রকম ফলের গাছ! টসটসে ফলগুলো যেন ওকে চেখে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে!

তাকে অবাক করে আগের মতোই কে যেন বলে উঠল, 'ফল নেবে গো, ফল?'

আবারও থমকাবার পালা। আগের মতো ইতিউতি চোখ ফেলল সামনে-পেছনে। ডানে-বামে। নাহ, কাউকেই

একলা

নজরে আনতে পারল না সে।

সুন্দর ফুল আর ফল দেখে সত্যিই সোহানের নিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কে দেবে এসব? দেবার মতো কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছে না। কোথাও থেকে না বলে কোনোকিছু নেওয়াটা কি ঠিক? না, মোটেও ঠিক নয়। তাই সোহান সে ইচ্ছের গুরুত্ব দিল না।

এটুকু আসার পর সে দুই পাহাড়ের দুটো নামও মনে মনে ঠিক করে ফেলল। একটা ফুল পাহাড় অন্যটা ফল পাহাড়।

সে এখন আরও সামনে এগিয়ে যাবে। সামনে কী অপেক্ষা করছে, দেখতে হবে তাকে।

আর কিছু না ভেবে সামনে এগিয়ে চলল সোহান। চারপাশের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে আকুল করে তুলল। তার মন যখন প্রসন্নতায় ভরে উঠল, ঠিক তখনই একদল মানুষের কলরব তার কানে ভেসে এল। মনে হলো বেশ কজন মানুষ এক জায়গায় হয়ে আনন্দ-কোলাহলে মেতে উঠেছে। আর তা খুব বেশি দূরে নয়।

খুশিতে সোহানেরও মন ভরে উঠল। যাক, অবশেষে মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল তাহলে! কিন্তু পরক্ষণেই একটু সতর্ক হলো। এই কোলাহল মানুষের না হয়ে অন্য কিছুরও তো হতে পারে! তাই সে সরাসরি তাদের মুখোমুখি হতে চাইল না। লুকিয়ে দূর থেকে আগে দেখতে চায় সে।

সেই ভাবনায় সে গাছের আড়াল নিয়ে সামনে এগিয়ে চলল। মিনিট কয়েক চলার পর সেই উল্লাস ধ্বনি আরও স্পষ্ট হলো। তারপর সে যা দেখল, তা তার কল্পনার অতীত। একদল পরি একে অপরের হাত ধরাধরি করে নাচছে আর গান গাইছে। এই সঙ্গে তারা পরস্পর কী নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে। কিছুটা দূরে থাকায় ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না যে, লোফালুফির বস্তুটা আসলে কী!

পরিদের দেখে সোহানের সাহস বাড়ল। আর যাই হোক, এরা খারাপ নয়। গল্প পড়ে পড়ে পরি চরিত্র নিয়ে মোটামুটি তার ধারণা ইতিবাচক। তাই মন থেকে তার লুকানোর চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। কিন্তু অসম্ভব সুন্দর দেখতে পরিরা কী নিয়ে অমন করে মেতে আছে?

আরও একটু এগিয়ে গেল। ওমা! এ কী দেখছে সে? পরিরা বাংলা বর্ণমালার কিছু অক্ষর নিয়ে লোফালুফি করছে! ডাইকাট করা নানা রঙের অ ক ল ম ই ও– এরকম আরও কিছু অক্ষর পরিদের হাতে হাতে।

খেলতে খেলতে হঠাৎ একজন পরির হাত থেকে ক বর্ণটি মাটিতে পড়ে গেল। আর অমনি সবার মাঝে থাকা একজন পরি শব্দ করে ধমক দিয়ে উঠল। হয়ত সে রানিপরি, সেরকমই ভাবল সোহান।

–কী করছ পরিবানু? সাবধান হও। এই পবিত্র বর্ণ মাটিতে ফেলো না। জানো, এই বর্ণের মূল্য কত?

সেই পরির ধমকে অন্য পরিরা কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল। মুখ কাচুমাচু হয়ে উঠল সবার।

সেই পরি আবার বলল, এই বর্ণ যেনতেন বর্ণ নয়, এখানকার প্রতিটি বর্ণের গায়ে মানুষের রক্ত লেগে আছে। ছোপ ছোপ লাল রক্ত। এই বর্ণ মিশেলে যে ভাষা হয়, তার নাম বাংলা ভাষা। সেই ভাষার জন্য পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটা দেশ, বাংলাদেশের মানুষ ১৯৫২ সালে জীবন দিয়েছে। অন্য দেশের অন্য ভাষার লোকেরা এই ভাষা পরিবর্তন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই ভাষায় মানুষ মানেনি সেটা। প্রতিবাদ করেছে। মিছিল করেছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে। আর তখন বাংলাবিরোধী সেই অন্য ভাষার পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। এতে রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, কিশোর অহিউল্লাহসহ অনেক মানুষ শহিদ হয়।

থামল রানিপরি। তার মুখে এই গল্প শুনে অন্য পরিরা তো থ। হায় হায় করে উঠল। মনে মনে খুব দুঃখ অনুভব করল। হাতে থাকা বাংলা বর্ণের প্রতি নতুন করে সমীহ জেগে উঠল। সবাই প্রায় সমস্বরে বলল, আমরা ভুল করেছি। অন্যায় করেছি। এসব কথা আমাদের জানা ছিল না। এই যে আমরা এখন এই বর্ণকে বুকে ধরলাম। আর কখনোই পবিত্র এই বর্ণকে মাটিতে পড়তে দেব না।

সোহান খেয়াল করল, এতে পরিদের বুকে থাকা বর্ণগুলোও যেন হেসে উঠল! তার সঙ্গে সেই বর্ণগুলোর মাঝে একেকজন ভাষাশহিদের ছবি ভেসে উঠল। এটা দেখে সোহান আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ল।

রানিপরি খুশি হলো অন্য পরিদের কথায়। তারপর আবার বলল, এরপরের ঘটনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সারা দেশের বাঙালি মানুষ দ্বিগুণ উদ্যমে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ফলে তারা আর পেরে ওঠেনি। বাঙালি বীরের কাছে কুচক্রী মহল মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এজন্য তারা বলে– একুশ মানে মাথা নত না করা। ভাষার জন্য এরকম লড়াই করার ঘটনা পৃথিবীতে আর নেই। এই বীরত্বের জন্য সারা বিশ্ব বাঙালিদের সম্মান করে। তাই তো একুশ এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাকে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়।

আর বাঙালি এমনই। নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে আপোশহীন। এরই পথ ধরে তারা ১৯৭১ সালেও তাদেরকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছে। এবং স্বাধীন হয়েছে। নিজেদের জন্য আদায় করে নিয়েছে একটা আলাদা ভূখণ্ড, আলাদা পতাকা।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, এই তো কদিন আগেও মানে ২০২৪ সালে ওই দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে জুলাই বিপ্লব ঘটে গেল। সেই বিপ্লবে তরুণ ছাত্রসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। সেদেশে চেপে বসা অত্যাচারী শাসকদের তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। সেখানেও ঝরেছে হাজার হাজার তরতাজা প্রাণ। বুক চিতিয়ে লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছে তাদের অধিকার।

এখানকার চারপাশ সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। সেই সবুজের মাঝে চমৎকার চমৎকার সব ফুলের সমাহার। কত ফুল! কোনো কোনো ফুল সে জীবনে চোখেও দেখেনি। চোখ জুড়োনো ছোটো ছোটো গাছে অচেনা সব পাখির আনাগোনা...

পরিরানি থামল আবার। সবার দিকে তাকালো। যেন উপস্থিত সকল পরির হৃদয় সে পাঠ করল। তাতে সে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা সবাই হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে।

তারপর পরিরানি আবার শুরু করল। বলল, আমরাও এই ভাষাকে সম্মান জানাতে চাই, মর্যাদা দিতে চাই।

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরাও এই পরিরাজ্যে ভাষাশহিদদের জন্য শহিদমিনার বানাবো। ফুল দিয়ে, গান গেয়ে আমরা শহিদদের প্রতি সম্মান জানাবো।

এ কথায় সবাই হইহই করে উঠল। আর রানিপরিকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এসবই একরাশ বিস্ময় আর অবাক হয়ে দেখছিল সোহান। পরিদের প্রতি ভক্তিতে মাথা নুয়ে এল। এবার সে পরিদের মাঝে গিয়ে হাজির হয়ে তাদের অবাক করে দেবে। যাদের নিয়ে পরিদের এত ভাবনা-ভালোবাসা, সেই গর্বিত দেশের গর্বিত মানুষ সে। মনে মনে এই বলে সোহান সামনে পা বাড়ালো। কিন্তু পারল না। কেমন করে যেন তার দু'চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিছুতেই চোখ মেলে থাকতে পারল না। গভীর ঘুম চোখে সেখানেই ঢলে পড়ল সে। কতক্ষণ ঘুমালো সে জানে না। তারপর যেন তার কানে ভেসে এল, কে যেন ডাকছে তাকে। খেয়াল করে শুনে বুঝল কণ্ঠটা তার চেনা। আর সে হলো পরিরানি।

পরিরানি বলল, সোহান ওঠো। প্রভাতফেরিতে যাবে না? ওঠো।

সোহান বিড়বিড় করে বলল, কী করে যাব? আমি যে খুব অসুস্থ। তাছাড়া, ফুলও জোগাড় করতে পারিনি। কীভাবে যাব শহিদমিনারে? ফুল ছাড়া শহিদ ভাইদের শ্রদ্ধা জানাবই বা কীভাবে?

–তুমি ওঠো। দেখো, একদম সুস্থ হয়ে গেছ তুমি। তোমার জন্য এক ডালি ফুলও এনেছি। তাড়াতাড়ি উঠে তৈরি হও। খালি পায়ে বেরিয়ে পড়ো। বন্ধুদের আগে আগে শহিদমিনারে যেতে পারলে নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে।

ওই শোনো, ভাষার গানে গমগম করছে চারদিক। দিকে দিকে মুখরিত হয়ে উঠেছে–

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি... ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদনা সহযোগী, শিশু পত্রিকা

বর্ণমালায় ঝিকমিক

মিয়াজান কবীর

ভাষাশহিদ রফিক
বর্ণমালায় ঝিকমিক!
ভাষার শপথ নিয়ে-
বুকের রক্ত দিয়ে।

হলেন ভাষার অনীক।
পাখি গায় ভাষার গান
নদী বহে কলতান
আমরা চলি নির্ভীক!

একুশ আমার গান

সায়মা জাহান তন্বী

একুশ আমার মুখের ভাষা
একুশ আমার গান।
একুশ মানে মায়ের ভাষা
বাংলায় কথা বলা।

একুশ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য
বিলিয়ে দিল কত প্রাণ।
একুশ আমার বুকের সাহস
এগিয়ে যাওয়ার বাতিঘর।

একুশে আমার স্বাধীনতার পাখা
মুক্তাকাশে ওড়ার আশা।
একুশ মানে ভাইয়ের রক্তে
মাতৃভাষার সম্মান।

অষ্টম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলা আমার

বেণীমাধব সরকার

বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার প্রাণ,
বাংলা ভাষায় কথা বলি
বাংলাতে গাই গান।

বাংলা ভাষায় পরাণ ভরে
ডাকি আমার মাকে,
বাংলা ভাষায় পাখপাখালি
মধুর সুরে ডাকে।

পদ্মা গড়াই মধুমতি
নদীর কলতানে
বাংলা সুরের ধ্বনি যেন
বাজে আমার কানে।

মৌমাছিরা ফুলবাগানে
মৌ কুড়াতে ছোটে
বাংলা গানের মধুর গীতি
গুনগুনিয়ে ওঠে।

বাংলা আমার মুক্ত প্রাণে
যুক্ত অহংকার,
তাই তো আমি কাড়তে পারি
বিজয় বারংবার।

পরিচয়

হুসাইন আলমগীর

ম-তেই আমি প্রথম ডেকেছি,
'মা',
বাংলা ছাড়া মা-কে আমার
কোথাও পাবে না!

বাবা-কেও পাবে 'ব'-তে
বাংলার এই বর্ণমালা এসেছে স্বর্গ হতে!

বাংলা বর্ণ বাংলা ভাষা
আল্লাহ'র উপহার
হৃদয়ে রেখেছি যত্ন করে
খুলে দেখি বারবার।

অ আ ক নিছক বর্ণ নয়
সোনার মোহর জান্নাতি নূর-এ আমার পরিচয়।

বাংলায় আমি প্রথম কেঁদেছি
পৃথিবীতে রেখে পা
যেদিন যাবো সেদিনও যেন বাংলায় কাঁদি, মা।

RvZxq MšvMvi w`em

বই হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। মানুষের ভিতরের অন্ধকার দূর করে আলোকিত সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে বই হলো শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। বই মানুষের মনের দ্বার খুলে দিয়ে চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে। বইয়ের মাধ্যমে জানতে পারি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, জাতি, ভাষার মানুষ সম্পর্কে। প্রতিটি সফল মানুষ নিয়মিত বই পড়তেন। ওয়ারেন বাফেট তার পেশা জীবনের শুরুতে প্রতিদিন ৬০০ থেকে ১০০০ পৃষ্ঠা নিয়মিত বই পড়তেন, বিলগেটস প্রতি বছর ৫০টি বই পড়েন। বই পড়লে মানুষের চিত্ত প্রফুল্ল হয়। বই নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন– 'বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না।

আর বইয়ের আবাসস্থল হলো গ্রন্থাগার। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই উৎপত্তি হয় গ্রন্থাগার বা পাঠাগার। যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি লাইব্রেরি। গ্রন্থাগার একটি জাতির বিকাশ ও উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই তো প্রতি বছর ৫ই ফেব্রুয়ারি পালিত হয় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস।

গ্রন্থাগার শুধু ভালো ছাত্রই তৈরি করে না, একজন ভালো মানুষ হতেও শিখায়। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে জাতীয় চেতনার জাগরণ। মানুষদের গ্রন্থাগারমুখী করা, পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা ও মননশীল সমাজ গঠনের জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার নিয়ে বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'লাইব্রেরি হচ্ছে এক ধরনের মনের হাসপাতাল।'

বাংলাদেশে ১৯৬৫ সালে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২১শে জানুয়ারি ঢাকার শেরেবাংলা নগরে গ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫ সালে ডাইরেক্টরেট অব আর্কাইভস অ্যান্ড লাইব্রেরিজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। এছাড়াও সবার জন্য ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গণগ্রন্থাগার (Public Library)। ১৯৭৭-৭৮ সালে গ্রন্থাগারটি শাহবাগের নতুন ভবনে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় একটি করে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরির সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে। কারণ বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ তার আপন সত্তার পরিচয় পায়। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়া মানুষকে শোকে–সান্ত্বনা, দুঃখে -দুঃখ জয়ের ব্রত , ব্যর্থতায় ধৈর্য ধরার শক্তি জোগায়। নির্মল আনন্দ পাওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ❑

মেজবাউল হক

কবিতায় একুশ

মধুর ভাষা বাংলা

কাজল নিশি

একুশ মানে ভাই হারানো
বোনের চোখে জল
বাংলা মা তোর মধুর ভাষা
বিশ্বে সমুজ্জ্বল।

একুশ মানে বাংলা ভাষায়
কথা বলি হেসে
বাঁচতেও চাই ধরার বুকে
বাংলা ভালোবেসে।

একুশ মানে ভাষা দিবস
হৃদয় জুড়ে থাকা
খোকা-খুকুর ড্রয়িং খাতায়
শহিদমিনার আঁকা।

বাংলা ভাষার গান

সনজিত দে

ভোরের দোয়েল মাতৃভাষাতে মন কাড়ে মধুশিসে
আমিও আমার মায়ের ভাষাতে অবারিত থাকি মিশে।
কতদিন আমি মায়ের ভাষাটি শুনিনি মায়ের মুখে
তার সে মধুর ভাষার আবেগে দুলেছি দুঃখ-সুখে।

নীরব কেন মা, খোকন ডাকটি শুনি না কেন যে আর
তুমিহীন বড়ো একা একা লাগে আজ এই সংসার।
তোমার মধুর স্নেহের ভাষার সুর আজ অপসৃয়
যেখানেই থাকো মাগো অন্তত স্বপনেও সাড়া দিও।

তোমার সোনালি স্মৃতির মাঝারে ডুব দিলে নিরজনে
প্রাণটা কেমন আনচান করে কত কথা জাগে মনে।
তুমি মা আমার সেই জননীই একুশের ঝাঁঝাঁ রোদে
ছেলেদের তুমি বলেছিলে যাও জেগে ওঠো প্রতিশোধে।

বলেছিলে যাও, মায়ের ভাষার দাবিতে কাঁপাও পথ
তোমার কথায় তোমার ছেলেরা চালালো ভাষার রথ।
অবশেষে তাজা বুকের রক্তে হয়েছে সূর্যোদয়
এইভাবে আসে বাঙালির প্রিয় মাতৃভাষারই জয়।

মাগো তুমি নেই; স্মৃতি অমলিন হৃদয়ে তোমার ছবি;
তবুও তোমার ভাষার আদরে আমি আজ ছড়া কবি।

কাঠপেনসিলে বর্ণমালা

রাশেদ আহাম্মেদ সাদী

বাংলা ভাষায় বলব আমি
বাংলায় গান গাইব,
এই ভাষারই বর্ণমালায়
হরেক কথা শিখব।

লিখতে গেলে মনে আসে
কতশত কথা,
সপ্ত রঙে ছেয়ে আছে
দেশের বিজয়গাথা।

দেশের কথা লিখতে হলে
থাকবে অন্তে মিল,
লেখার সময় লিখি যেন
হাতে নিয়ে পেনসিল।

আমার দেশের সকল শিশুর
শিক্ষা মিলে স্কুলে,
বাংলা ভাষা লিখে তারা
কাগজে কাঠপেনসিলে।

তোমার ভাষা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার

ই' শিখেছি উ' শিখেছি
আর কি শেখা লাগে
তোমার কাছে ম' শিখেছি
অ' শেখারও আগে।

ম' এর পরে আ' মিশিয়ে
মা ডেকে যাই তোমায়
ভাষার কোনো নাম জানি না
প্রশ্ন করলে আমায়।

প্রশ্ন করা হলে কভু
তোমার ভাষাই বলি
যখন থেকে তোমার হাতে
হাত রেখে মা চলি।

চলতে তুমি শিখিয়েছ
দু'হাত আমার ধরে
বলিও তাই তোমার মতো
আঁকাবাঁকা করে।

বাংলা ভাষা

মো. তাইফুর রহমান

বাংলা আমার চাওয়া পাওয়া
বাংলায় কথা বলি
বাংলায় আমি জীবন কাটাই
বীরের মতো চলি।

বাংলা ভাষায় মনের কথা
ব্যক্ত আমি করি
বাংলা আমার মনের ভাষা
বাংলায় জীবন গড়ি।

ভাষার জন্য, দেশের জন্য
মরল মানুষ কত
বীর বাঙালি হার মানে না
শির করে না নত।

বাংলা আমার মাতৃভূমি
বাংলা পরিপাটি
বাংলা আমার মুখের ভাষা
বাংলা অনেক খাঁটি।

বাংলা ভাষায় গল্প বলি
বাংলায় লিখি আমি
বিশ্ববাসী সবার কাছে
বাংলা অনেক দামি।

আমার বাংলা ভাষা

শফিকুল মুহাম্মদ ইসলাম

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
কে ভুলিতে পারে,
বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা
স্লোগান বারে বারে!

মায়ের ভাষা রক্ষা করতে
রইল তাঁরা মেতে;
রাজপথ ভাসে ভাইয়ের রক্তে
মুক্ত বুলি পেতে!

বাংলা ভাষা রক্তে কেনা
বিশ্বের বুকে গৌরব,
তার মহিমায় কৃষ্ণচূড়া
ছড়িয়েছে সৌরভ!

আন্দোলনের এই সূচনায়
ভাষার স্বাধীনতা;
আমরা কি আর ভুলতে পারব
এই গৌরবের কথা!

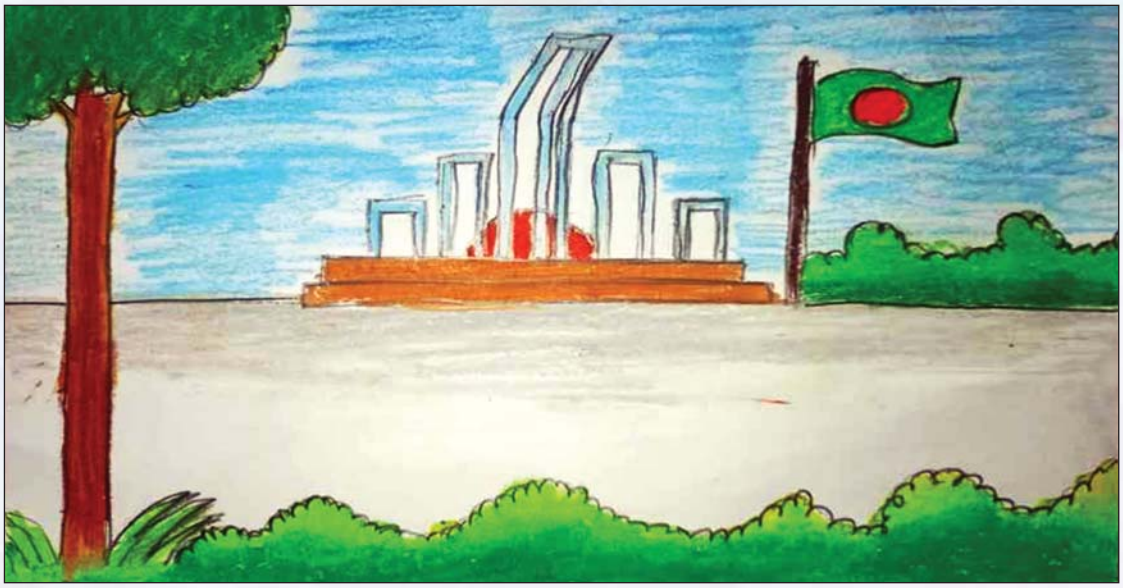

মো. নাইমুল ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, চরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

গল্প

কেন লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়া

সারমিন ইসলাম রত্না

গাছের ডালে কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা হাসছে না। ফাল্গুনের বাতাস বইছে। কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা বাতাসে দোল খাচ্ছে না। গাছের পাতারা বলল, হে কৃষ্ণচূড়া ফুল, কী হয়েছে তোমাদের? কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা চুপ করে রইল। ফাল্গুনের বাতাস বলল, হে কৃষ্ণচূড়া ফুল, তোমরা কথা বলছো না কেন? কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা তখনো চুপ করে রইল। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা মন খারাপ করেই রইল।

ওরা লাল থেকে আরও লাল হয়ে উঠল। ওদের সেই রক্তিম লাল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। সবুজ পাতারা লাল হয়ে গেল। সবুজ ঘাসের বুক লাল হয়ে গেল। নীল আকাশ ধীরে ধীরে লাল হতে শুরু করল। এমন সময় কোকিল পাখি উড়ে এসে কৃষ্ণচূড়া ডালে বসল। কোকিল পাখি বলল, হে কৃষ্ণচূড়া ফুল, তোমরা এমন লাল হয়ে যাচ্ছ কেন? তোমাদের মন খারাপ দেখে আকাশের মন খারাপ। বাতাসের মন খারাপ। প্রকৃতিও তোমাদের রক্তিম রঙে লাল হয়ে যাচ্ছে। তাই ছুটে এসেছি। কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা বলল, হে কোকিল পাখি, আমাদের একটি গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমরা গান গাইতে পারি না। আমাদের একটি গান শুনতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু শুনতে পারছি না। তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাও। কোকিল পাখি অবাক হয়ে বলল, কি গান? কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা বলল,

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা যত মায়ের অশ্রু গড়ায় ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

কোকিল পাখি অবাক হয়ে বলল, কী মমতা মাখা! কী দুঃখ মাখা! এই গান। ঠিক আছে। আমি গেয়ে শোনাচ্ছি। কোকিল পাখি গানের কথাগুলো সুরে সুরে গাইল। কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা গান শুনে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

গাছের পাতারা বলল, কাঁদছ কেন? ফাল্গুনি বাতাস

বলল, কাঁদছ কেন? কোকিল পাখি বলল, এভাবে কাঁদছ কেন? কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা বলল, আজ আমাদের স্মরণীয় দিন। আমাদের ঐতিহাসিক দিন। রক্ত ঝরানোর দিন। প্রিয়জন হারানোর দিন। আমাদের আনন্দের দিন। তাই কাঁদছি। গাছের পাতারা বলল, আমরা শুনতে চাই স্মরণীয় দিনের কথা। ঐতিহাসিক দিনের কথা। ফাল্গুনি বাতাস বলল, আমরা শুনতে চাই রক্ত ঝরানো দিনের কথা। প্রিয়জন হারানো দিনের কথা। কোকিল পাখি বলল, আমিও শুনতে চাই দুঃখ মেশানো আনন্দ দিনের কথা।

কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তখন ১৯৪৭ সাল। আমাদের দেশের নাম ছিল পূর্ববাংলা। আমাদের দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর ভারত বিভক্তির ফলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি দেশের অন্তর্ভুক্ত হই। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলা নাম বদলিয়ে আমাদের দেশের নাম রাখল পূর্ব পাকিস্তান। শুরু হলো আমাদের ওপর শাসন ও শোষণ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা কেড়ে নিতে চাইল। পশ্চিম পাকিস্তানের জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। তারা বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই অযৌক্তিক প্রস্তাবে চরম বিরোধিতা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল কাশেম, তমদ্দুন মজলিস সহ আরো অনেকে। শুরু হলো মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঘোষণা দিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ জনতা। ১৯৫২ সাল, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৮ই ফাল্গুন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ১৪৪ ধারা জারি করল।

রাজপথে আন্দোলন শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগানে মুখরিত হলো আকাশ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ১৪৪ ধারা ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকল। হঠাৎ আন্দোলনের ওপর গুলি চালানো হলো। মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ নাম না জানা আরও অনেকে। আকাশ থেকে নামল রক্তিম বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে আমরা লাল হয়ে গেলাম। আর হয়ে থাকলাম এই স্মরণীয় দিনের সাক্ষী। প্রতিবছর এই দিনটি ফিরে আসে। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। ৮ই ফাল্গুন। আমরা লাল থেকে আরও লাল হয়ে যাই। কখনো ভাই হারানোর দুঃখে কাঁদি। কখনো মাতৃভাষা বাংলা ফিরে পাওয়ার জন্য আনন্দে কাঁদি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা আবার কাঁদতে শুরু করল।

গাছের পাতা, ফাল্গুনি বাতাস, কোকিল পাখি স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর ওরা বলল, হে কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা, আমরা বাংলাদেশের হতে পেরে গর্বিত। আমাদের রয়েছে রক্ত ঝরানো, দুঃখ মেশানো আনন্দের ইতিহাস। আমাদের রয়েছে রক্ত দিয়ে পাওয়া মাতৃভাষা বাংলা। এই বলে ওরা কাঁদতে থাকল। ঠিক তখনই আকাশ থেকে নামল দুঃখ মেশানো আনন্দের বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা ওদের স্বাভাবিক লাল রং ফিরে পেল। লাল হয়ে যাওয়া সবুজ পাতা আবার সবুজ হলো। লাল হয়ে যাওয়া ঘাসের বুক আবার সবুজ হলো। সবাই একসাথে গেয়ে উঠল,

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও বাচিক শিল্পী

গল্প

একটি ভাষার গল্প

পঙ্কজ শীল

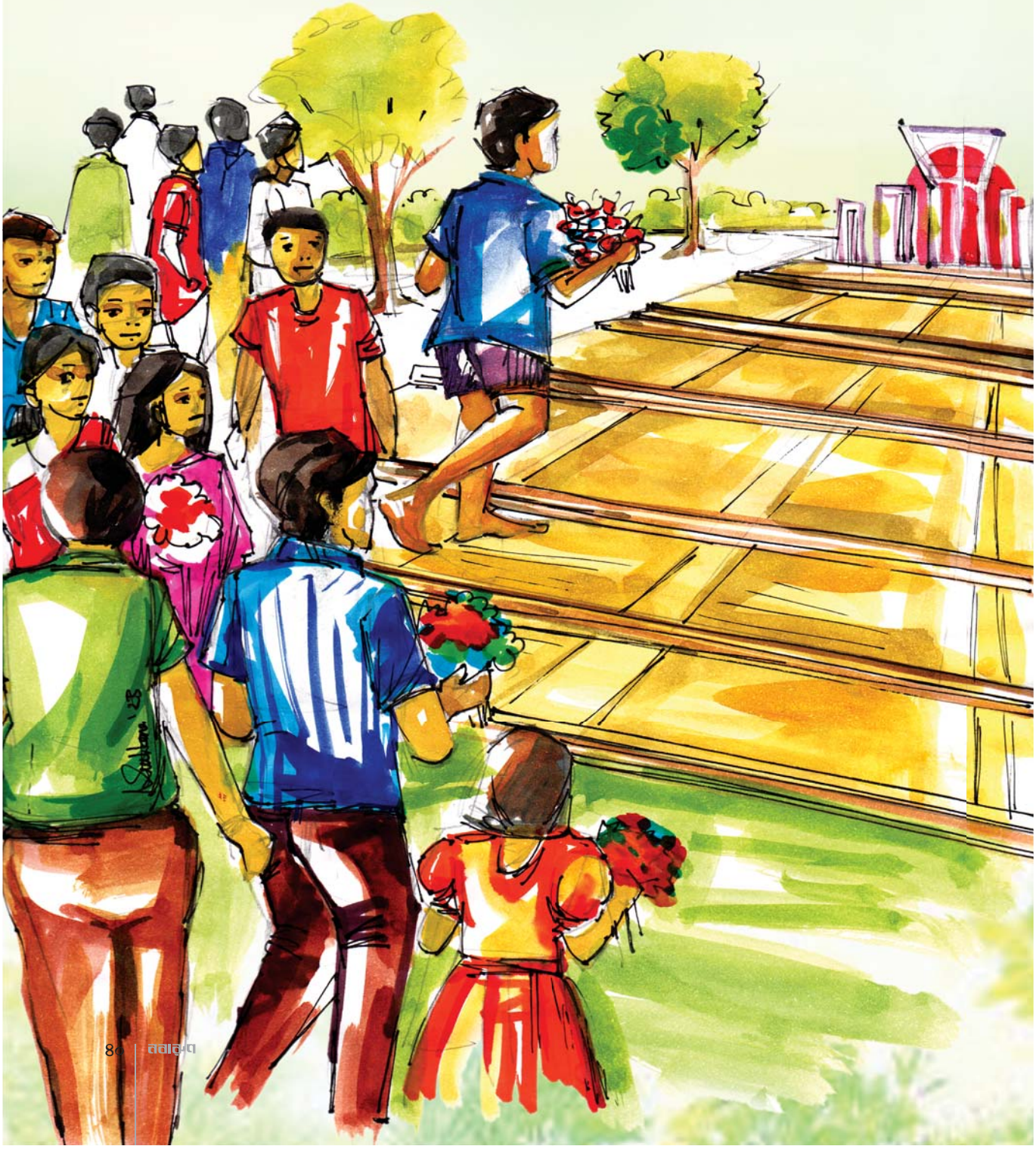

সকাল থেকেই রক্তিমের মনটা খারাপ। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। বাবা-মা বলেছে, আজ শহিদ মিনারে ফুল দিতে যাবে, কিন্তু রক্তিমের মন ভীষণ খারাপ লাগছে। সে জানে, একুশে ফেব্রুয়ারি মানেই বাংলা ভাষার জন্য লড়াইয়ের দিন, শহিদদের দিন। কিন্তু তার মনে হয়, সে এসব বুঝতে পারে না।

রক্তিমের বয়স মাত্র আট বছর। তবুও তার দাদু প্রতিদিন তাকে নানা গল্প বলেন, বিশেষ করে বাংলা ভাষার গল্প। আজ সকালে দাদু বলছিলেন,

'তুই জানিস রক্তিম, আমাদের ভাষা পেতে কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল?

রক্তিম মাথা নাড়ল, 'দাদু, আমি জানি না। তুমি বলো।'

দাদু হেসে বললেন, 'তাহলে চল, আজ তোদের একটা গল্প বলি। একবার এক ভাষার রাজ্য ছিল, যেখানে সবাই খুব আনন্দে কথা বলত। কিন্তু একদিন এক নিষ্ঠুর রাজা এসে বলল, 'এই রাজ্যে এখন থেকে শুধু আমার ভাষায় কথা বলতে হবে। অন্য কোনো ভাষা চলবে না।'

রক্তিম বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিন্তু দাদু, তাহলে সেই ভাষার মানুষরা কী করল?'

দাদু বললেন, 'ওরা খুব কষ্ট পেল, কিন্তু ওরা হাল ছাড়ল না। ওদের মধ্যে কয়েকজন সাহসী ছেলে ছিল, যারা বলল, 'আমরা আমাদের ভাষা ছাড়ব না! আমরা কথা বলব, গান গাইব, বই পড়ব সবই আমাদের ভাষায়।'

রক্তিম উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তারপর?'

দাদু চোখ বন্ধ করে বললেন, 'তারপর ওরা রাজপথে নেমে এল। সেদিন ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ছাত্র—সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার তারা সবাই মিলে প্রতিবাদ করল। তারা বলল, 'আমাদের ভাষার অধিকার চাই!' কিন্তু রাজা তাদের কথা শুনল না। সে সেনাদের দিয়ে তাদের ওপর গুলি চালালো।'

রক্তিম আঁতকে উঠল, 'গুলি? তাহলে কি তারা বেঁচে গেল?'

দাদু মাথা নাড়লেন, 'না, রে বোকা! তারা শহিদ হয়ে গেল। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। তাদের জন্যই আমরা আজ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি।'

রক্তিম চুপ করে রইল। তার মনে হলো, ভাষার জন্য এত বড়ো আত্মত্যাগ! সে তো এসব জানত না!

শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে রক্তিমের মন কেমন যেন করে উঠল। বাবার হাত ধরে সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সারি সারি মানুষের ভিড়। সবাই কালো ব্যাজ পরে এসেছে, হাতে হাতে ফুল।

বাবা বললেন, 'রক্তিম, এই যে মিনার, এটি বানানো হয়েছে ভাষা শহিদদের স্মরণে। আমরা এখানে ফুল দেই, কারণ তারা আমাদের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিল।'

রক্তিম হাতের ফুলগুলো ভালো করে ধরল। তার ছোট্ট হাতের গোলাপের তোড়া যেন আরও ভারী লাগছিল। সে ফুলগুলো মিনারের বেদিতে রাখল, চোখ বন্ধ করল, আর মনে মনে বলল, 'ধন্যবাদ, ভাইয়া, তোমরা না থাকলে আমি বাংলা বলতে পারতাম না!'

তখনই যেন হালকা বাতাস বইল। গাছের পাতাগুলো মৃদু কেঁপে উঠল, আর দূর থেকে ভেসে এল এক মিষ্টি কণ্ঠের ফিসফিসানি-

'আমাদের ভাষাকে ভালোবেসো, রক্তিম! এটিই আমাদের চিরদিনের গর্ব!' ❑

কবি ও শিশুসাহিত্যিক

গল্প

বর্ণমালার গল্প

মিতুল সাইফ

ভোর হয়েছে কেবল। রাতের ঘোর তখনো লেগে আছে চোখে। বর্ণদের ছাদে থরে থরে টবে টবে ফুল ফোটে মাথা দোলাচ্ছে। যেন বলতে চাচ্ছে- দেখো বর্ণমালা, আমরা অবশেষে ফুটেছি, তোমাদের অনেক অপেক্ষর পর আমরা এসেছি তোমাদের ফুলবনে, রঙে আর গন্ধে তোমাদের সাথে আমরাও খুশি হতে চাই। দখিনের ফাগুনের হাওয়ায় এ কথাই যেন সমস্ত বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বর্ণ আর মালা। মিষ্টি দুটো ভাই বোন। বড়ো সখের বাগান তাদের। মা-বাবার উৎসাহ আর সব রকম সহযোগিতায় এ সব সম্ভব হয়েছে। আজ ঘুম ভাঙতে এত দেরি হবার একটা কারণ আছে অবশ্য। কাল ছিল মালার জন্মদিন তাই কেক কেটে খাওয়া দাওয়া সারতে গিফটের প্যাকেট খুলতে বেশ দেরি করে ঘুমাতে যাওয়া, আর সে কারণেই ঘুম ভাঙতে সময় লাগছে।

বর্ণর ঘুম ভাঙলো আগে। ঘুম চোখেই বর্ণ টুথব্রাশ হাতে সোজা ছাদে উঠে গেল। গাছে গাছে ফুল দেখে খুশিতে তার মন নেচে উঠল। এক ছুটে গিয়ে মালাকে ডেকে নিয়ে এল। দুই ভাই বোন মিলে অনেক আনন্দ করল, নাচল, গাইল, তারপর মা-বাবাকে ডেকে এনে চমকে দিলো। মা-বাবাও অনেক খুশি। বর্ণ মালার সাথে বাবা-মা'ও অনেক মজা করলা।

বর্ণ পড়ে থ্রিতে। মালা পড়ে প্লে। দু ভাইবোন একই সাথে স্কুলে যায়, ফিরেও আসে একই সাথে। কোনো প্রাইভেট টিউটরের ঝামেলা নেই। বেশিরভাগ সময় মায়ের কাছে পড়ে দুজন। বাবা সময় পেলে অংক শেখায়। আর মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস শোনায়। সে সব শুনতে শুনতে বর্ণ মালার চোখ ভিজে যায়। মনের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ অংকুরিত হয়। বাবার কথা বলার মধ্যে এমন একটা জাদু আছে; যা সব বয়সের মানুষকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে সক্ষম। আর বাবা এমন আবেগ জড়িত কণ্ঠে এসব ইতিহাস শোনায় যে তা থেকে সহজেই বোঝা যায় বাবার এ দেশের জন্য, ভাষার জন্য কত ভালোবাসা আর মমতা।

বর্ণ মালার মা নাদিয়া পারভিন বাড়িতেই থাকেন। বাবা আব্দুল্লাহ আল মামুন সরকারি চাকুরে। মায়ের সাথেই বর্ণ মালার বেশিটা সময় কাটে। মা দারুণ গান করে আবার সেলাই এর কাজ জানে। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত। সে সুবাদে বাড়িতে মাঝে মধ্যেই গানের রিহার্সেল হয়। সেসব শুনে শুনে আধো আধো কণ্ঠে গেয়ে ওঠে বর্ণ মালা। তা শুনে মা বাবার মন ভরে যায়।

শনিবার বিকেল চারটা থেকে দু ভাই বোনের কোনো খোঁজ নেই। দারোয়ান মতি মিয়াও কিচ্ছু বলতে পারে না। মা তো কেঁদে কেটে অস্থির। কখনো তো এমন হয়নি। না বলে ওরা কোথাও যায়নি। মায়ের ফোন পেয়ে বাবা দ্রুত ছুটে এল। আশপাশের বাড়িতে, খেলার মাঠে, বাড়ির সামনের খেলনার দোকান গুলোতে... নাহ্! কোথাও নেই। ছাদে উঠে মায়ের আরো কান্না পেলো। টবে একটাও ফুল নেই। একটা টব ভাঙা.. তবে কি... কেউ এসে...! নানা রকম দুশ্চিন্তা মা বাবাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন অনেকেই ছুটে এল। শহরের সবগুলো হাসপাতালে খোঁজ নেয়া হলো। নাহ্ ! কোথাও নেই বর্ণ মালা। সন্ধ্যের আগে কাজের বুয়া খবর দিলো চিলেকোঠায় কোনো লোক ঢুকেছে। তাদের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

খুব সাবধানে চিলেকোঠার ঘরের দরজাতে সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো, তার মানে দরজা খোলাই ছিল, শুধু দরজার কপাট ঠেলে রাখা। ভিতরে ঢুকে সবাই অবাক! বর্ণ আর মালা ফুলের মালা তৈরি করেছে আর সেই মালার মধ্যে কলম দিয়ে লিখেছে 'অমর একুশ'। বাবা মাকে দেখেই বর্ণ মালা বলল-কাল মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, শহিদমিনারে ফুলের মালা দেবো বলে নিজেদের গাছের ফুলে এই মালা গেঁথেছি, কেমন হয়েছে বাবা ? কেমন হয়েছে মা?

মা বাবা বর্ণ মালাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। চোখ ভিজে গেল তাদের, এ এক অন্য অনুভূতি, অন্য ভালোলাগা, অন্য আবেগ! উপস্থিত সবাই সমস্বরে গেয়ে উঠল- আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

মায়ের মতো মিষ্টি

সারাফ নাওয়ার

আজ আমার জন্মদিন। ২১ বছর বয়স হলো। এদিন সবাই যখন কেক কেটে উদ্‌যাপন করে আমি তখন ফুল দিয়ে দিন শুরু করি। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, 'খারাপ লাগে না?' সত্যি বললে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে দিনটা ভাষা শহিদদের জন্য উৎসর্গ করতে গর্ব বোধ হয়। যাঁরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে তাঁদের জন্য এটুকু করব না! এই গল্প আমার দাদুর কাছে শোনা। সত্যিকারের গল্প। আমার দাদু ভাষা সৈনিক ছিলেন। ছোটোবেলায় আমাকে গল্প শোনাতেন। আজ দাদু নেই কিন্তু দাদুর গল্প, অনুভূতি, আত্মত্যাগ সব আমার প্রতিদিনের সঙ্গী। কারণ আমি যে ভালোবাসি বাংলায় কথা বলতে। তখন আমি খুব ছোটো, দাদুর সাথে হাঁটতে বের হতাম। দাদুর হাত ধরে এক বিকালে শহিদ মিনার গেলাম। দাদু বলল, দেখছ রুপা, ওটা শহিদমিনার। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে বানানো হয়েছে। আমিও সেই আন্দোলনে গিয়েছিলাম। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। দেশ উত্তাল। পুর্ব বাংলার ৫৬% বাংলা ভাষাভাষী। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।' এতে আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়ে। বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ হতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা বাংলা ভাষা রক্ষায় আন্দোলন করে। আমিও গিয়েছিলাম।

আমাদের চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ে কত জন। সালাম, রফিক, জব্বার সহ অনেকে শহিদ হয়। আমিও আহত হয়েছিলাম। তাদের জন্য আমরা মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে পারি। একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে তাদের সম্মান দেখানো আমাদের কর্তব্য। সেদিন কথাগুলো অনেক ভারি মনে হয়েছিল। একটু বড়ো হয়ে বুঝতে পারি। ভালো লাগে জন্মদিনটা ওভাবে পালন করতে। ঐ দিনের জন্য আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্বে অনন্য। দিনটা আমাদের সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়। আমি বাংলায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। নিজের ভাষায় সব থেকে কঠিন অনুভূতিও সহজে প্রকাশ করা যায়। বাংলা ভাষা আমার কাছে মায়ের মতো মিষ্টি। ❑

শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

কবিতাগুচ্ছ

মায়ের ভাষা

নকুল শর্ম্মা

আয় রে তোরা কে কে যাবি
শহিদমিনারে,
প্রভাতফেরির লোক ভিড়েছে
পথের কিনারে।

ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে
আয় রে খালি পা,
বর্ণমালায় সাজিয়ে দিই
শহিদ ভাইয়ের গা।

যাঁদের জন্য পেলাম আমরা
ফিরে মায়ের ভাষা,
তাঁদের দানেই লুকিয়ে রয়
সকল ভালোবাসা।

যাঁদের জন্য নিজের ভাষায়
বর্ণমালা লিখি,
ভাইয়ের ঋণে মায়ের নামটি
মুক্তাক্ষরে শিখি।

বর্ণমালা ও বাংলা ভাষা

নূর মোহাম্মদ দীন

বাংলা ভাষার বর্ণমালার
বর্ণগুলোর জন্য
বলি পড়ি লিখি শিখি আমরা খুবই ধন্য।

বাংলা ভাষার বর্ণগুলো
বিশুদ্ধ সব ধ্বনি
ধ্বনিমালা হলো সবই বাংলা ভাষার মণি।

বর্ণ বলো ধ্বনি বলো
বাংলা মায়ের ভাষা
বাংলা আমার জীবন-মরণ বাংলা ভালোবাসা।

জীবন দিয়ে বীর ছেলেরা
রাষ্ট্র ভাষা আনলো
অনন্য এক ভাষা আমার বিশ্ববাসী জানলো।

বর্ণফুলের স্বর্ণ গাঁথায়

আনোয়ারুল হক নূরী

বর্ণমালার বকুল মালা গলায় দিলে মাকে।
জীবনটাকে বিকিয়ে দিল রক্ত-নদীর বাঁকে।
ওষ্ঠ হাসির উছল ধারায় বর্ণরেখায় ফোটে।
মায়ের মুখে মিষ্টি কথা ছন্দ হয়ে ওঠে।

তোমরা নাকি শহিদমিনার পাথর হয়ে থাকো।
প্রতি কথায় একটা করে শহিদমিনার আঁকো।
ফাগুন এলে আগুন জ্বালাও এই কি তোমার স্মৃতি?
তোমরা হলে মায়ের মুখে প্রতি কথার প্রীতি।

তোমার নাকি শোকের পাথর কাতর ছবি আঁকা।
বর্ণফুলে ফুটতে থাক নিতুই প্রাণে রাখা।
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে তোমার আছো প্রাণে।
বর্ণফুলের স্বর্ণ গাঁথায় মা ও মাটির ঘ্রাণে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

মো. কামরুজ্জামান

বাংলা ভাষার গৌরবের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি,
অশ্রু ভেজা, রক্তে রাঙা প্রভাতফেরি,

সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার,
তাদের ত্যাগেই জাগ্রত বাংলা ভাষার দ্বার।

ভুলব না কভু সে রক্তের দান,
বাংলা আমার গর্বের গান।

মায়ের ভাষা হৃদয়ে লালন,
একুশ মানে সাহসের আলোড়ন।

মায়ের ভাষা আপন সুরে,
বাজে এখন বিশ্বজুড়ে।

ভয়াল দিনের সেই ইতিহাস,
একুশ গড়ে নব বিশ্বাস।

ভাষার মান রক্ষা করি,
বাংলা মোদের গর্বের তরি।

বইমেলা

তাসিন হোসেন

অমর একুশে গ্রন্থমেলায়
লাগে যেতে ভালো
মজার সব বই পড়ে
খুলে মনের আলো।

হই হুল্লোড়ে কাটাবো
দেখব ঘুরে পুরো মেলা
বইয়ের ছোঁয়ায় যাবে কেটে
আমার সারা বেলা।

৮ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

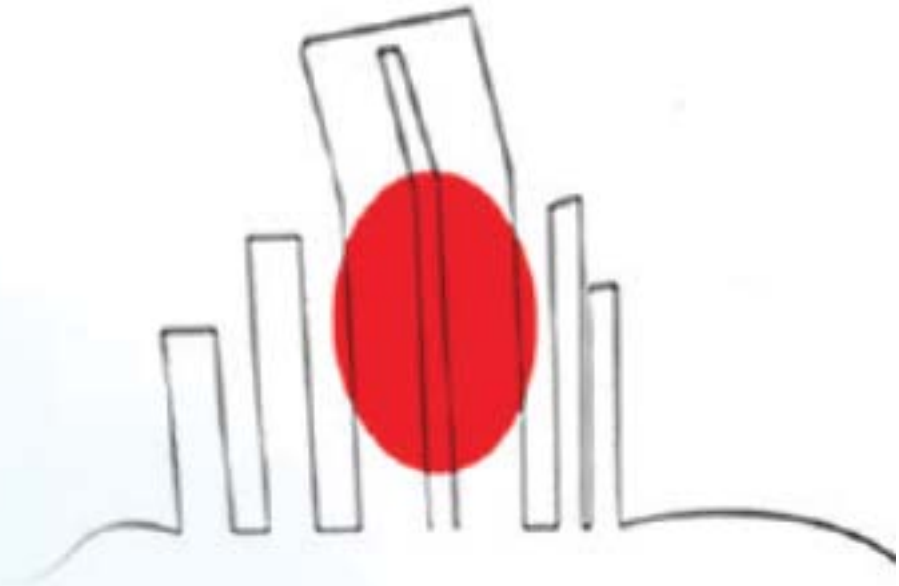

একুশে ফেব্রুয়ারি

জাওয়াদ আলম

বছর ঘুরে এল আবার
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি
শহিদমিনারে শ্রদ্ধা জানাব
ছিটিয়ে ফুলের পাপড়ি

বাংলা আমার মাতৃভাষা
তাই তো আমি ধন্য
যাদের আত্মত্যাগে পেয়েছি
হাজার সালাম তাদের জন্য।

অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

একুশ

সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু

একুশ
বাংলার বাউল গান,
একুশ
বাংলার হৃদয়ের টান।
একুশ
বাংলার রক্ত চোষা,
একুশ
বাংলা মায়ের ভাষা।
একুশ
বাংলার মুক্তিযোদ্ধা,
একুশ
বাংলার লাখো শ্রদ্ধা।
একুশ
বাংলার সবুজ দেশ,
একুশ
বাংলার বাংলাদেশ।

পড়তে হবে বই

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

বইয়ের মতো এমন সুজন
আর তো কেহ নয়,
বই জীবনের সঙ্গী হয়ে
মনের কথা কয়।

একাকীত্বে ভোগার পরে
বই পড়ে যেই জন,
পড়ায় মনে লাগায় দোলা
কাটে সুখের ক্ষণ!

অন্ধকারে জ্বালায় আলো
বইয়ের অপার জ্ঞান,
জরার জ্বালা দূর হয়ে যায়
করলে বইয়ে ধ্যান !

জানতে হলে শিখতে হলে
পড়তে হবে বই,
না পড়লে বই জ্ঞানের অর্জন
করব আমরা কই?

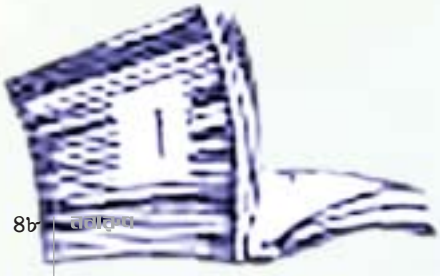

একুশের শপথ

মাহফুজুল ইসলাম

একুশ এল আবার ফিরে,
স্মৃতির পাতায় ব্যথা ঘিরে।
রক্তে লেখা ভাষার ইতিহাস,
বুকের মাঝে রাখি বিশ্বাস।

ফাগুন আসে, ফুল ঝরে,
শহিদের স্মরণ অশ্রু ঝরে।
কালো রাতের শেষের প্রহর,
জাগিয়ে তোলে আশা বহর।

বাংলা ভাষার গৌরব গাথা,
চিরদিন রবে সে তা।
শপথ আজ, শপথ নেব,
ভাষার মর্যাদা রক্ষা করব।

বইমেলার ভালোবাসা

ফারদিন শামস তিমির

নতুন বছর। সালটা বলেই দেই, দু'হাজার পঁচিশ'। কিন্তু এর রেস ছ'মাস আগের। জুলাই চব্বিশের। অদ্ভুত এক মাস গণনা -'ছত্রিশে জুলাই'। তার পথ ধরে এল নতুন সকাল। ছোট্ট আনিকা জানেনা, আন্দোলন কাকে বলে। অবশ্য আমিও আন্দোলন কী তা ভালো বুঝি না। বড়ো ভাই নিয়ামত আকরাম আমাকে বলল, 'তুই ন্যায্য যা চাস, তা পেতে তুই যে লড়াই করিস, তা-ই আন্দোলন। ধর, পিঁপড়েরা চিনি চায়, তারা চিনি না পেলে কী করবে, বলবে -'চিনি আমাদের দিতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে।' অতসব জানি না, শুধু টিভিতে দেখেছি, রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বালানো, হাজার হাজার মানুষের ভিড় রাস্তায়, মাঝে মাঝে ধোঁয়া ধোঁয়া, ফটাস ফটাস গুলির শব্দ। তখন আকাশেও অনেক মেঘ ছিল। তারপর আকাশ পরিষ্কার হলো। থামা গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করল। আর ঘুরতে ঘুরতে সেই গাড়িটা একটা বছর শেষ করে নতুন বছরে চলে এল। জানুয়ারি মাস শেষ, এল ফেব্রুয়ারি। সকালবেলা, আকাশে হালকা কুয়াশা। মাঘের ঠান্ডা রোদ। রোদ যেন চাদর গায়ে হাঁটছে। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে একুশের বইমেলা, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে। চারদিকে মানুষের ভিড়, নতুন বইয়ের গন্ধ আর পাঠকদের কোলাহলে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত।

আনিকা আর নিনিত দু'ভাই-বোন। তারা বই পড়তে খুব ভালোবাসে। এবার তাদের বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের নিয়ে বইমেলায় যাবেন। সকাল থেকেই তাদের উত্তেজনা এক্কেবারে তুঙ্গে।

বিকেলে বাবা-মায়ের সাথে তারা বইমেলায় এল। প্রবেশপথে বিশাল ফেস্টুনে লেখা 'বই পড়ি, দেশ গড়ি'

- লেখাটা দেখে আনিকা বলল,

-নিনিত, বুঝলি! বই পড়লেই দেশ গড়া যায়।

নিনিত মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছো! চলো, দেখি কী কী বই আছে!'

মেলার ভেতরে ঢুকে তারা তাকিয়ে দেখল, সারি সারি স্টল, প্রতিটিতে নতুন নতুন বই সাজানো। কিছু বইয়ে রঙিন পাতা, রঙিন আঁকা, কিছুতে কালো-সাদার মিশেল, কিছুতে বিজ্ঞানের জাদু আরও কত কী!

একটি স্টলে আনিকার চোখ পড়ল পশুপাখির বইয়ে। সে জানতে চাইল,

-বাবা, এই বইগুলোতে কী আছে? সাথে সাথে বইয়ের দোকানদার বললেন, নেন স্যার খুব ভালো রাইটার, প্রচ্ছদ করেছেন ধ্রুব এষ। দাম দেড়'শ টাকা মাত্র।

আচ্ছা বাবা, এই প্রচ্ছদটা আবার কী জিনিস ?

বাবা হেসে বললেন, ওটাকে ইংরেজিতে বলে কভার পেজ। বইয়ের সবচেয়ে ওপরের পাতাই হলো কভার। যা দেখতে আকর্ষণীয় লাগে।

-আর ওই পশুপাখির বই ?

-'এগুলো আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা বলে, ইতিহাস বলে, তাদের কারণে ও অবদানে কেমন করে আমাদের জীবন রক্ষা পায়। তার কথাই আছে এসব বইয়ে।'

আনিকা আগ্রহ নিয়ে কয়েকটা বই হাতে নিয়ে নেড়ে দেখল।

অন্যদিকে নিনিত ফেলুদার বই নিয়ে উচ্ছ্বসিত। সে বলল,

-বাবা, এই গোয়েন্দা গল্পগুলোর কথা কি সত্যি?

এবার মা হেসে বললেন, 'এগুলো কল্পনা, কিন্তু গল্পের মাধ্যমে তোমরা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে পারবে।'

একজন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। বই দেখার ফাঁকে তারা এক জায়গায় ভিড় লক্ষ্য করল। একজন নামকরা লেখক অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। আনিকা ও নিনিত দৌড়ে গেল সেদিকে।

-স্যার, আপনি এত সুন্দর গল্প লিখতে পারেন কীভাবে? রাফি জানতে চাইল।

লেখক মৃদু হেসে বললেন, অনেক বই পড়তে হয়, চিন্তা করতে হয়, আর কল্পনাকে উড়তে দিতে হয়। বই পড়লেই মনের জানালা খুলে যায়।

আনিকা জিজ্ঞেস করল, আমরা কীভাবে ভালো লেখক হতে পারি?

লেখক বললেন, প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখো, আর নিয়মিত বই পড়ো। বই পড়লে ভাষার জ্ঞান বাড়বে, চিন্তাশক্তি গভীর হবে।

লেখকের এ কথা শুনে আনিকা ও নিনিত খুব অনুপ্রাণিত হলো।

বেশ কিছু পছন্দের বই কেনার পর তারা মেলা থেকে বের হলো। আনিকা বলল, বইমেলায় এসে বুঝলাম যে বই শুধু বিনোদন না, জ্ঞান অর্জনের বড়ো মাধ্যমও!

নিনিত মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, আর লেখকের কাছ থেকে শিখলাম, পড়তে হবে, লিখতে হবে, তবেই বড়ো কিছু হওয়া যাবে!

বাবা-মা হাসলেন। বাবা বললেন, সত্যিকারের জ্ঞানী হতে হলে বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে হবে।

সেদিন আনিকা আর নিনিত বইমেলা থেকে শুধু বই কেনেনি, তারা পেয়েছিল নতুন এক উপলব্ধি, জ্ঞানার্জনের যে পথ বইয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তা।

বইমেলা শুধুই বই বিকিকিনির জায়গা না, তা হলো বিভিন্ন জ্ঞানকে জানার মহোৎসব। এখান থেকে মানুষ ইতিহাস শেখে, সাহিত্য বোঝে, নতুন নতুন চিন্তাও করতে শেখে।

বইমেলার নতুন অভিজ্ঞতা আনিকা ও নিনিতের মনে গভীর দাগ কাটল। তারা বুঝল, একটা বই একটা নতুন জগত। যেখানে জ্ঞান, কল্পনা আর নতুন চিন্তার আকাশ থাকে। ওরা বলল -বাবা, আমরা সত্যিই, বই খুব ভালোবাসি। ❑

একাদশ শ্রেণি, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্‌বোধন শেষে বইয়ের স্টল ঘুরে দেখেন, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ -পিআইডি

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

প্রাণের মেলা বইমেলা। 'বইমেলা' শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলা। যে মেলা বইপ্রেমি মানুষের প্রাণে দোলা দেয়। কারণ বইমেলা হচ্ছে আনন্দ, মিলন আর ভাব আদান-প্রদানের এক গতিশীল স্টেশন।

কোনো এক অদৃশ্য শক্তিবলে লাখো মানুষকে টেনে আনে একাডেমির বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণে। বইমেলা মানেই বর্ধমান হাউস ও এর আশপাশ ঘিরে জমে ওঠে লেখকদের জমজমাট আড্ডা। বইমেলা মানেই লেখক-প্রকাশকদের নির্ঘুম রাত কাটা। প্রকাশিত হয় হাজার হাজার বই। নতুন বইয়ের মৌ মৌ গন্ধে মোহিত হয় মেলায় আসা ক্রেতা, দর্শনার্থী। বিক্রি হয় লাখ লাখ কপি বই।

একজন বইপ্রেমী হাজারো মানুষের ভিড় ঠেলে পছন্দের বইটি হাতে পাওয়ার পর আনন্দে চিকচিক করে ওঠে তার মুখ। তারপর বইটি নিয়ে প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফ নেওয়ার চেষ্টা। মঞ্চের সামনে বসে আলোচনা কিংবা দাঁড়িয়ে একটু গান শোনা। এসবই আমাদের কাছে খুব চেনা এবং জানা একটি বিষয়। কিন্তু আমরা অনেকেই এই মেলার ইতিহাস জানি না। চলো জেনে নেই অমর একুশে গ্রন্থমেলার ইতিহাস।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের কাছে ব্যাপকভাবে একুশে বইমেলা নামেই পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম এই মেলার ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের মতোই প্রাচীন।

যতদূর জানা যায়, ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার শুরু করেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমানে মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লেখকদের লেখা বই। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি মহান একুশে মেলা উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ মূল্যছাড়ে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি মুক্তধারা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স বাংলা একাডেমির মাঠে নিজেদের বই বিক্রির ব্যবস্থা করে।

১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমির মাঠের কিছু জায়গা চুনের দাগ দিয়ে প্রকাশকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রকাশকরা যে যার মতো স্টল তৈরি করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় পর্যন্ত এই বইমেলার কোনো নাম ও স্বীকৃতি ছিল না।

১৯৭৮ সাল থেকে একুশের এই বইমেলাকে বাংলা একাডেমির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। ওই সময় অমর একুশে উপলক্ষে ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হতো। তখন মেলার নাম ছিল একুশে গ্রন্থমেলা।

১৯৮১ সালে একুশে বইমেলার মেয়াদ কমিয়ে ২১ দিনের পরিবর্তে ১৪ দিন করা হয়। কিন্তু প্রকাশকদের দাবির মুখে ১৯৮২ সালে মেলার মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করে করা হয় ২১ দিন। মেলার উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমি। সহযোগিতায় ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

এরপর মেলার সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে বাদ দিয়ে ১৯৮৪ সাল থেকে এই মেলার নতুন নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এসময় থেকেই একুশের বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে নিয়মিতভাবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সময়ের পরিক্রমায় বইমেলার পরিসর বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এর বড়ো একটি অংশকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফলে ঐতিহ্যের শিকড় আরও বিস্তৃত হয়েছে। যে মেলা একুশের মহান ঐতিহ্যকে ধারণ করে এত বিশাল আকার ধারণ করেছে, তা এখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্থান সোহাওয়ার্দী উদ্যানের পাদপীঠে স্থান পেয়েছে।

মেলায় প্রায় পাঁচশ' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সারিবদ্ধ স্টলের মধ্যে একপাশে থাকে শিশু কর্নার। আরেক পাশে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টল। এই সংখ্যা অবশ্য কোনো কোনো বছর বাড়ে আবার কমে।

মেলায় থাকে মিডিয়া সেন্টার। যেখানে থাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। এছাড়া থাকে লেখক কর্নার এবং তথ্যকেন্দ্র। মেলা প্রাঙ্গণ রাখা হয় পলিথিন, ধূমপান এবং হকারমুক্ত। মেলায় বই বিক্রির উপর ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় থাকে। এছাড়া মেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর পাশাপাশি রাখা হয় বিশেষ টাস্কফোর্স। যারা মেলার সার্বিক নিরাপত্তার পাশাপাশি বইয়ের কপিরাইট বা মেধাসত্ত্ব আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা শনাক্ত করেন ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেন।

মেলার তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়ত নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের খবর, প্রতিদিন প্রকাশিত বইগুলোর নাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেল মেলার মিডিয়া স্পন্সর হয়ে মেলার তাৎক্ষণিক খবরাখবর দর্শক শ্রোতাদের অবহিত করে। এবারের মেলাও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং আর দেরি নয়। সময় পেলেই চলে এসো বইমেলায়। ❑

তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ - প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয় তারুণ্যের উৎসব-২০২৫। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩০শে ডিসেম্বর থেকে কর্মসূচি শুরু হয় তারুণ্যের উৎসবের। এ কর্মসূচি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫- এর লক্ষ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উদ্‌যাপন করা।

উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, জুলাই-৩৬ সংক্রান্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কর্মশালাসহ বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন চিরুনি অভিযান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়া স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার হাত ধোয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ’ শীর্ষক আন্তঃস্কুল বিতর্ক ও কলেজ পর্যায়ে ‘ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের চেয়ে ব্যক্তিগত সচেতনতাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ’ শীর্ষক বিতর্কের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৫ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৫ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, উইলস লিটল ফ্লাওয়ারসহ ঢাকার বেশকিছু বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে তারুণ্যের উৎসব-এর আয়োজন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ

১লা জানুয়ারি একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় যা নারায়ণগঞ্জ নগর ভবন হতে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিমখানাস্থ নগর পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরবর্তীতে নগর পার্কে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করা হয়। ওই দিন কর্মশালা, সমাবেশ, বিতর্ক

প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাঙামাটি

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ই জানুয়ারি শহরের জিমনেশিয়াম মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। তাছাড়া এ উপলক্ষে রাঙামাটিতে জেলা পর্যায়ে আন্তঃ স্কুল ও আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নাটোর

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় ৭ই জানুয়ারি তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে কুইজ, রচনা, বিতর্ক এবং জুলাই-৩৬ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

বগুড়া

শেরপুর সদর উপজেলায় 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ৭ই জানুয়ারি সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মশক নিধন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও জলাবদ্ধতা নিরসন কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাগেরহাট

১৯শে জানুয়ারি নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশ নেন। তাছাড়া বাগেরহাট বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোগে ১২ দিনব্যাপী মেলা, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা, ভলিবল টুর্নামেন্টসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় তারুণ্যের উৎসব উদযাপন করা হয়।

টাঙ্গাইল | মুন্সিগঞ্জ | নরসিংদী | সিলেট

তারুণ্যের উৎসব ঘিরে বিভিন্ন জেলার আয়োজন

নওগাঁ

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে নওগাঁর নিয়ামতপুরে তারুণ্যের উৎসব পালন করা হয়েছে। ৬ই জানুয়ারি নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

কক্সবাজার

কুতুবদিয়ায় তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ই জানুয়ারি উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে র‍্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে তারুণ্য উৎসব ও আনন্দ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ৬ই জানুয়ারি উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

মুন্সিগঞ্জ

তারুণ্যের অদম্য শক্তি এবং দেশ গড়ার মানসিকতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মুন্সিগঞ্জে ৫২ দিনব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব' শুরু হয়। ৫ই জানুয়ারি কয়েকশত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন জেলা প্রশাসক। ❑

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ফাগুন

মো. জাহিদুর রহমান

ফাগুন মানে মিষ্টি সুরে
কোকিলের ডাক,
ফাগুন মানে গাছে নতুন
পাতাদের ঝাঁক।

ফাগুন এলে দখিন হাওয়া
মিষ্টি লাগে
প্রজাপতি উড়তে থাকে
ফুলের বাগে।

ফাগুন মানে দিকে দিকে
রক্তরাঙা ফুল,
ফাগুন এলে ভরে ওঠে
হৃদয়-নদীর কূল।

বসন্তে কোকিল কেন ডাকে

আরিফুল হক

বসন্ত এলেই কোকিলের মিষ্টি-মধুর কুউও-কুউও ডাক শোনা যায়। অনেকটা বিরামহীনভাবে ডাকে। তবে অন্য ঋতুতে বিশেষ আকর্ষণীয় এই পাখিটি কী তবে এমন ডাকে না? প্রশ্ন উঁকি দেয় মনে। শীতে আমাদের রুক্ষতা ও শুষ্কতা শেষে প্রকৃতি সতেজতা ফিরে পেতে থাকে। পাতাঝরা গাছ কচি পাতায় ভরে ওঠে। নতুন পল্লবে সজ্জিত গাছের মগডালে বসে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে কোকিল 'কুউও... কুউও' সুরে সুমধুর কণ্ঠে অবিরাম ডাকে। কোকিলের ডাকে শিল্প খুঁজে পান কবি-সাহিত্যিকেরা। বনে যেমন পলাশ, শিমুল ফুল ফোটে বসন্তের আগমনী বার্তা দেয় আমাদের চোখে। কোকিল ডেকে বার্তা দেয় আমাদের কান ও হৃদয়ে। বসন্ত আর কোকিল তাই সমার্থক।

আলাস্কা, সাইবেরিয়াসহ বরফে আচ্ছাদিত এলাকা বাদে কোকিলের বসবাস পৃথিবীজুড়েই। কোকিল মূলত কুকুলিডি (Cuculidae) পরিবারের বৃক্ষবাসী পাখি। এই পরিবারে ১৩৬ প্রজাতি আবিষ্কার হয়েছে সারা পৃথিবীতে। পক্ষীবিজ্ঞানীদের মতে, এক প্রজাতির কোকিল পৃথিবী থেকে সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোকিল কীটপতঙ্গ, ক্যাটারপিলার ও রসালো ফল (বট, ডুমুর, পাকুড় ইত্যাদি) খায়। বাংলাদেশে কোকিল পরিবারে ১৮ প্রজাতির পাখি আছে, যার মধ্যে ৯ প্রজাতি পরিযায়ী কোকিল। বাকিরা আবাসিক কোকিল। কোকিল পরিবারের যেসব পাখি বাংলাদেশে দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল এশীয় কোকিল, পাতি চোখগ্যালো, বউ কথাকও পাপিয়া, করুণ পাপিয়া এবং এশীয় কোকিলের ডাক গ্রামবাংলা ও শহরে শোনা যায়। ঢাকা-শহরে বসন্তে যে কোকিল প্রজাতির ডাক শুনি আমরা, সেটি হলো এশীয় কোকিল। ছেলে পাখি দেখতে চকচকে কালো এবং কালো রঙের মধ্যে নীল ও সবুজের আমেজ থাকে। মেয়ে পাখির রং বাদামির ওপর সাদা ও পীতাভচিতি। মেয়ে কোকিল একটু নিশ্চুপ ও ঠান্ডা প্রকৃতির হয়। নিভৃতচারী একাকিত্বে থাকা এই কোকিল সারা বছর ডাকাডাকি করে না।

মেয়ে কোকিল শুধু তীব্র কিক্-কিক্-কিক্ শব্দে ডাকে।

সব প্রাণীর নিজস্ব ভাষা আছে, তাদের সারা বছরই ডাকাডাকির প্রয়োজন হয়। কোকিলেরও হয়। আমরা যে কোকিলের ডাক শুনি এটা আসলে কোকিলের স্বাভাবিক ডাক নয়। এই ডাকটা বসন্তকালেই বেশি শোনা যায়। পুরুষ কোকিল গলায় সুর বেঁধে গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে গিয়ে ডেকে চলে 'কুউ... কুউ...সুরে। মেয়ে কোকিল কখনোই উচ্চ স্বরে ডাকে না। সাধারণত প্রজনন মৌসুম ছাড়া কোকিল ডাকে না। থাকেও একাকী। বসন্ত ঋতু কোকিলের ডিম পাড়ার মৌসুম। বংশবিস্তারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও বাসা বানানো, ডিমে তা দেওয়া ও ছানা পালন এসব কিছুই এড়িয়ে যায় সুচতুর এ পাখি। এরা শুধু অন্য পাখির বাসায় প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ডিম পাড়ে। অন্য পাখিকে বোকা বানানোর মোক্ষম হাতিয়ার তাদের এই কুউও-কুউও ডাক। কোকিল সাধারণত ছোটো পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। কাক, ফিঙে, ছাতারে, শালিকসহ অন্য যেসব পাখির ডিমের সঙ্গে কোকিলের ডিমের মিল রয়েছে, সেসব পাখির বাসার সামনে গিয়ে একনাগাড়ে ডাকতে থাকে পুরুষ কোকিল। এতে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ডিমে তা দেওয়া মেয়ে পাখি তার সঙ্গীকে নিয়ে তাড়া করে পুরুষ কোকিলটিকে। তখন ওৎ পেতে থাকা মেয়ে কোকিল পোষক পাখির খালি বাসায় গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি ডিম পাড়ে। আর সেখান থেকে একটি ডিম খেয়ে ফেলে অথবা বাসা থেকে নিচে ফেলে দেয়। ডিমে তা দেওয়া পোষক পাখি ও এর সঙ্গী বাসায় ফিরে এসে দেখতে পায় ডিমগুলো ঠিকঠাক আছে। দেরি না করে আবার বসে যায় তা দিতে। মাত্র ১২ দিনে কোকিলের ডিম ফুটে ছানা বের হয়। ছানাটিও বাবা-মায়ের মতোই চালাক হয়ে থাকে। অন্য ডিম ও ছানাকে সে সরিয়ে দেয় বাসার কোনায়। এতে করে পোষক পাখি ও তার সঙ্গী যেসব খাবার আনে তার সব কিছুই মুখে পুরে নেওয়ার সুযোগ পায় পুঁচকে ছানা। বেশি বেশি খাবারের জন্য ফের কিচিরমিচির করতে থাকে ছানাটি। এভাবে সে তার পোষক মা-বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। অন্য পাখি যখন বুঝতে পারে এটি তার ছানা নয়, তত দিনে উড়তে এবং নিজের খাদ্য নিজে চিনে ফেলে কোকিল-ছানা। নিভৃতচারী একাকিত্বে থাকা এই কোকিল সারা বছর ডাকাডাকি করে না। মেয়ে কোকিল শুধু তীব্র কিক্-কিক্-কিক্ শব্দে ডাকে। ❑

প্রাবন্ধিক

প্রথম বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট

ক্রীড়াঙ্গনে গত কয়েক মাসে বেশ কিছু সাফল্য দেখল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের মাটিতে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় এবার প্রথম বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন চট্টগ্রামের তাম্মাত বিল খোয়ার। বিশ্বের প্রথম সাইক্লিস্ট হিসেবে বাংলাদেশের তাম্মাত মাত্র ৩০দিনে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পসহ ৪টি পর্বত ও ৩টি পাস একই সফরে পাড়ি দিয়েছেন সাইকেলে।নিজের জন্মদিনে দেশকে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড উপহার দিলেন তাম্মাত। এই রেকর্ড ভাঙা হয়নি, তৈরি করা হলো। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের দেশের জন্য সর্বোচ্চ গর্বের বিষয়।ইতোমধ্যে প্রথম বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট হিসেবে সাইকেল নিয়ে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, পিকে পিক, চুখুং রি পিক, কংমালা পাস, কালা পাথার, চোলা পাস, গোকিও রি পিক পাড়ি দিয়েছেন।

২৭শে নভেম্বর নিজের জন্মদিনে ৫৩৬০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত রেনজো লা পাসে উঠে এ রেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগে একই সফরে কোনো

সাইক্লিস্ট একইসঙ্গে এই ৮ অর্জন ছুঁতে পারেনি।। এর আগে বাংলাদেশের অনেকেই এভারেস্ট বেস ক্যাম্প জয় করলেও সাইকেল চালিয়ে প্রথম কেউ বেস ক্যাম্প জয় করল। দুপুরে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন তাম্মাত। দীর্ঘ ৫৩০০ মিটার পথ পাড়ি দিয়ে এই অর্জন করেছেন তিনি। লম্বা সময় ধরে সাইকেলিং করে তাম্মাত শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন।

জনপ্রিয় সাইক্লিস্ট তাম্মাত গত সাত বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় সাইকেলে ভ্রমণ করে রেকর্ড স্থাপন করেন এই তরুণ। প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে নেপালের ইস্ট ওয়েস্ট হাইওয়ে সাইক্লিং অভিযান সম্পূর্ণ করেছেন। ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় মহাসড়ক কভার করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সাইক্লিং অভিযানেও অংশ নেন।

এছাড়া তিনি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়ক হেঁটেছেন। তিনি বাংলাদেশ তৃতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ, ২০২০ সালে বাংলাদেশ গেমসে রৌপ্য এবং ২০২২ সালে ৪১তম জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতেন।

প্রসঙ্গত, সাইক্লিস্ট তাম্মাতের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জে। তবে জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। তার বাবা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেয়ামত আলী সিকদার, মা গৃহিণী নুরজাহান বেগম। ছয় ভাই, এক বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোটো। ❑

শাহানা আফরোজ

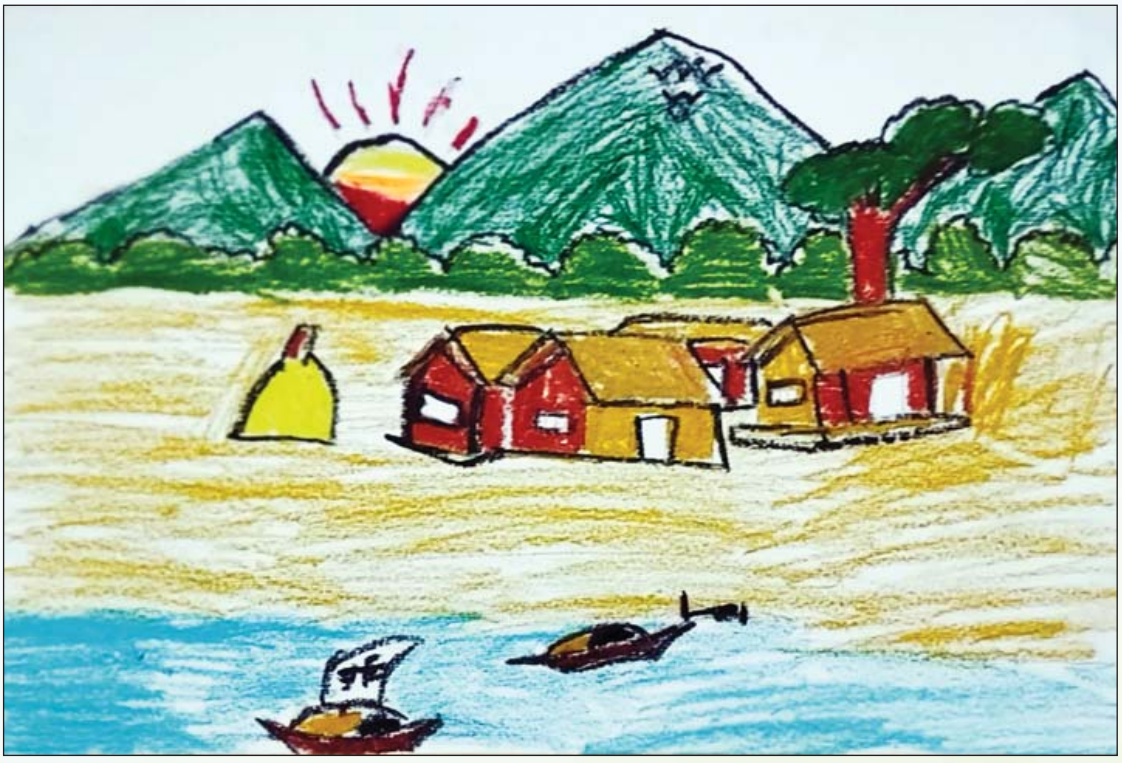

নাফি-উল আলম, প্রথম শ্রেণি, সানকিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সামিহা হোসেন উম্মি, তৃতীয় শ্রেণি, মডেল একাডেমি, মিরপুর-১, ঢাকা

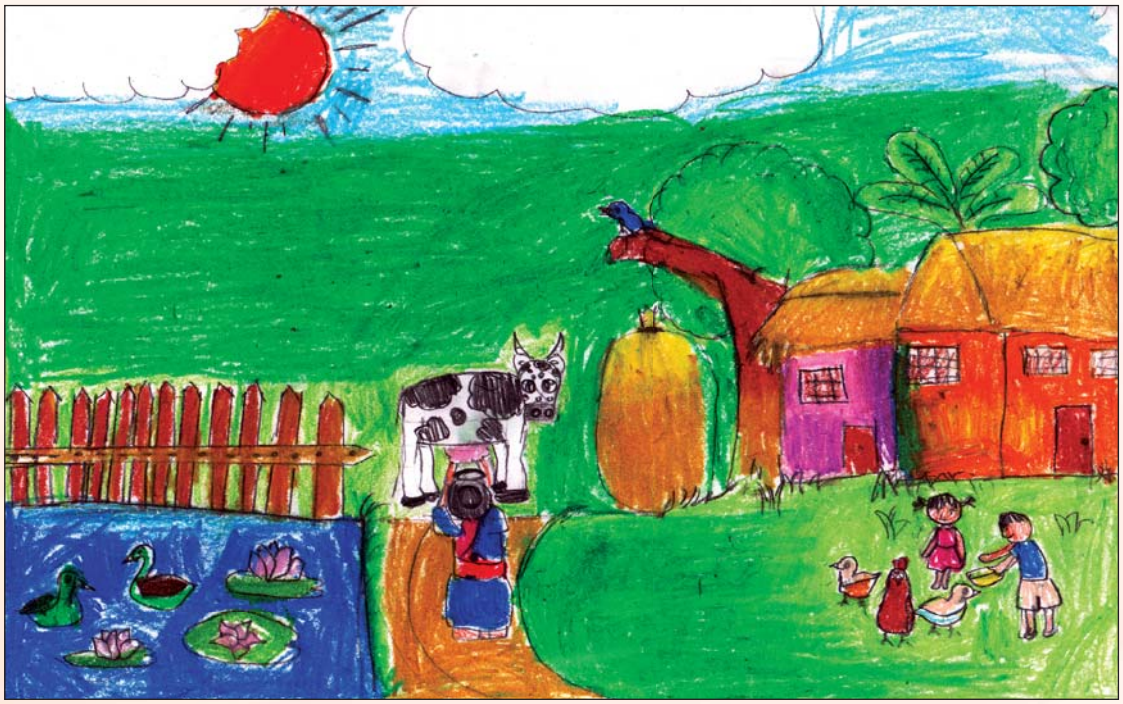

আনায়াহ্ আশরাফ, তৃতীয় শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

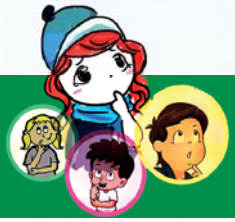

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র, ২. অনল, ৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে প্রদান করা সরকারি পদক, ৬. সূর্য, ৯. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করে আন্দোলন করা একটি সংগঠন

উপর-নিচ: ১. ২. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জহির রায়হানের লেখা একটি উপন্যাস, ৩. বিনয়ী, ৪. একরোখা, ৫. চূড়া, ৭. পরিতাপ, ৮. মূল্য

১.					২.		৩.
৪.		৫.					
		৬.	৭.				
	৮.						
৯.							

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধাঁর মতই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত: গাজীউল হক, চারুলতা, সজীব, চাচা কাহিনি, ছন্দ, পতাকা, হিড়িক, কাগজ, বছর, ঘর, কানন, দাগ, ঘন

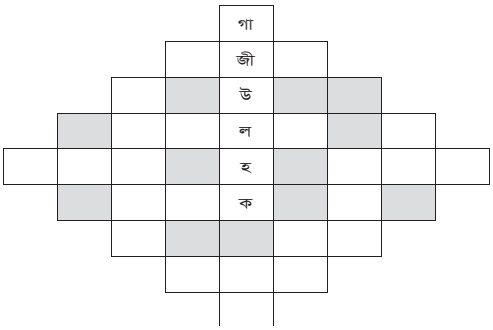

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭				৩	৭০			৭৩
	২৭		২৯				৭৯	
		৩১		১		৮১		
	২৫		৩৫		৬৭		৭৭	৭৬
১১		৩৩		৩৭		৬৫		৫৯
	২৩		৩৯		৬৩		৬১	
১৩		২১		৪৭	৪৮		৫৬	৫৭
	১৫		৪১	৪৬		৫০	৫৫	
১৭		১৯			৪৪			৫৩

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	*		-	৭	=	
*		*		*		*
	-	২	*		=	২
-		-		-		-
৯	*		-	৪	=	
=		=		=		=
	-	৫	+		=	৫

জানুয়ারি মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

জা	নু	য়া	রি		আ		
ম			ম	জ	বু	ত	
রু			ঝি		ধা		
ল	তি		ম	ত	বি	রো	ধ
	ন্দু			ছ		ম	
ন	ক	শ		ন	ল	কূ	প
গ				ছ		প	
দ	শ	মি	ক				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৫	*	২	-	৬	=	৪
+		*		*		+
৩	*	১	+	২	=	৫
-		+		-		-
১	*	৩	+	৪	=	৭
=		=		=		=
৬	-	৫	+	৮		৯

ছক মিলাও

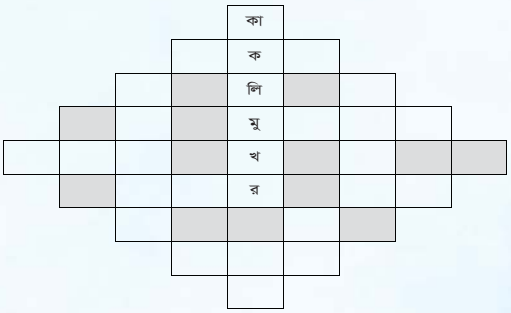

নাম্ব্রিক্স

৬৩	৬৪	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৫	৪	৩
৬২	৬৫	৬৬	৭৯	৮০	৭১	৬	১	২
৬১	৬০	৭৭	৭৮	৮১	৭২	৭	৮	৯
৫৮	৫৯	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৩৪	৩৩	১০
৫৭	৫৬	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩২	১১
৫৪	৫৫	৪০	৪১	২৮	২৯	৩০	৩১	১২
৫৩	৫২	৫১	৪২	২৭	২২	২১	২০	১৩
৪৮	৪৯	৫০	৪৩	২৬	২৩	১৮	১৯	১৪
৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	২৫	২৪	১৭	১৬	১৫

বিভিন্ন ভাষায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ইংরেজি

International Mother Language Day

আরবি

اليوم الدولي للغة الأم

চাইনিজ

国际母语日

ফ্রেন্স

Journée internationale de la langue maternelle

রাশিয়ান

Международный день родного языка

স্পেনিস

Día Internacional de la Lengua Materna

সাফওয়ান হক, তৃতীয় শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল

সাইয়ান খান, নবম শ্রেণি, স্বরূপচন্দ্র পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

আফিফা আলম, দ্বিতীয় শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ফাতেমা জান্নাত, নবম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

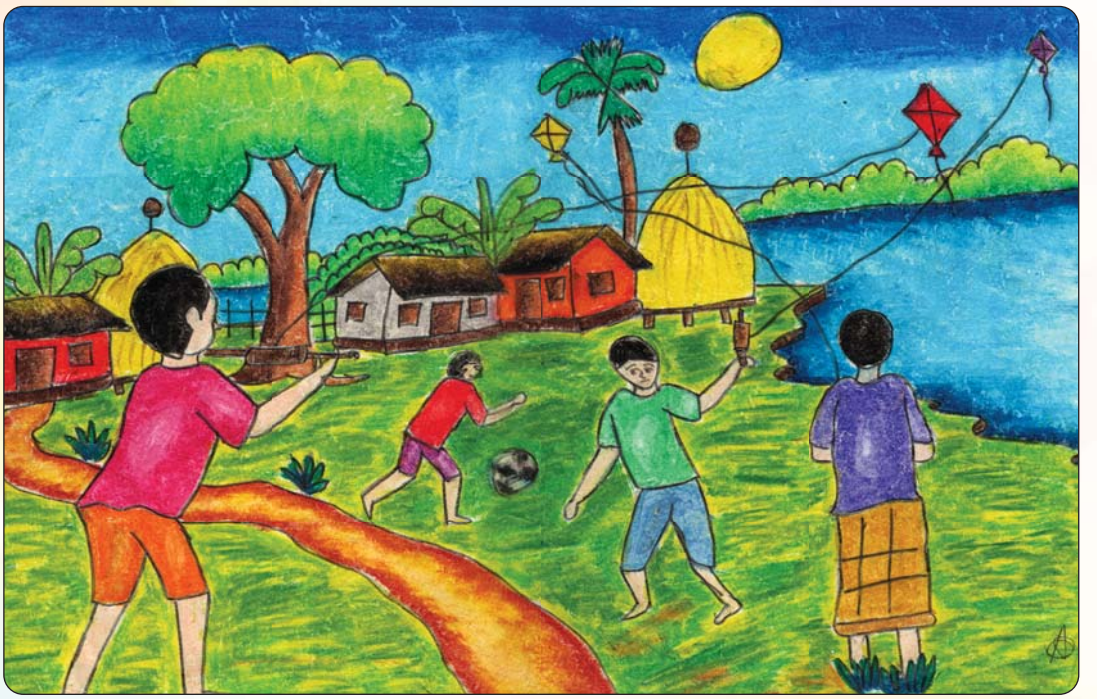

মো. তাহসিন ইসলাম রুহি, পঞ্চম শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল

আরিশা হাসান, প্রথম শ্রেণি, মতিঝিল কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-08. February 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

নাফিসা তাবাসসুম, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা